শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৭

এ-বারের সংখ্যায়

বাংলা সালের ইতিবৃত্ত

শুরু হল গ্রামজীবনের ধারাবাহিক কথা

বঙ্গাদর্শন

এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ

মিশন সমাচার | উজ্জ্বল প্রাক্তনী | বিশ্ববিচিত্রা | শিখরদেশ | সাত-পাঁচ | রত্ন চতুষ্টয় | আমাদের পাতা

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ■ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

সাফল্য ২০১৭

96.0%

০১-তম

কাজী দিলরুবা খানম

উচ্চ-মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থী		৬০%	৭০%	৭৫%	৮০%	৮৫%	৯০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	১০৭৬	১০৬৮	৯৯৯	৮৪৯	৫৩৬	২৩৭	৩৮	৯৫.৮%
ছাত্রী	৬০৯	৬০৭	৫৫০	৪৪৬	২৭৬	১৪২	৪৯	৯৬.০%
সর্বমোট	১৬৮৫	১৬৭৫	১৫৪৯	১২৯৫	৮১২	৩৭৯	৮৭	—

95.8%

১১-তম
মহ. তুহিন রানা

95.8%

১১-তম
সিনান হাম্মাম

95.2%

১৪-তম
আফরিন সুলতানা

95.2%

১৪-তম
সেখ আকিব উদ্দিন

94.8%

১৬-তম
তামান্না ইয়াসমিন

94.6%

১৭-তম
আনিশ আহমেদ

94.6%

১৭-তম
সোয়েব আক্তার

94.4%

১৮-তম
নাসরিন আখতার

94.2%

১৯-তম
হাবিবা আক্তার

93.4%

কে এম রুবাইয়াত

93.2%

সামিম অখতার

93.2%

দিলেরা পারভিন

93.0%

নাজিয়া সুলতানা

93.0%

মুসাইদা খাতুন

93.0%

ইমদাদুল হুদা

93.0%

গোলাম রেজা

মাধ্যমিক

97.3%

১০-তম
আব্দুল মালেক খান

97.1%

১১-তম
আফতাব আহমেদ

পরীক্ষার্থী		৬০%	৭০%	৭৫%	৮০%	৮৫%	৯০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	৭৪৪	৭৩৬	৭১৮	৬৬৭	৫৭৯	৪১৫	১৮৭	৯৭.৩%
ছাত্রী	৩২৪	৩১৭	২৮১	২৪৭	১৭৫	১০৭	৪০	৯৬.৩%
সর্বমোট	১০৬৮	১০৫৩	৯৯৯	৯১৪	৭৫৪	৫২২	২২৭	—

96.9%

১৩-তম
সাবির মণ্ডল

96.3%

১৭-তম
মিস রুমানা

95.9%

২০-তম
তামান্না জামান

95.9%

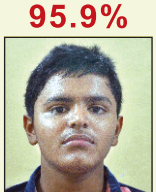

২০-তম
জাহিদ হাসান মোমিন

95.7%

আব্দুল হাফিজ নুরানি

95.6%

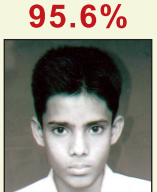

মহ. নাজির সেখ

95.4%

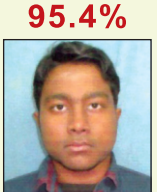

ওয়াসিম আক্তার

95.1%

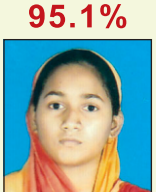

আনুফা লস্কর

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ফোন: (০৩২১৪) ২৫৭ ৭৯৬/৮০০, ৭৪৭৯০ ২০০৬৬
সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩ বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬

আল-আমীন বার্তা

পৌষ-চৈত্র ১৪২৩ । জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৭ । রবিউস সানি-রজব ১৪৩৮
সপ্তম বর্ষ ● প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামূল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি বাংলাদেশের রমণার ঐতিহাসিক বটমূলে অনুষ্ঠিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

ইতিকথা

বাংলা সাল গণনার শুরু কবে থেকে? বঙ্গাব্দ শব্দটিরই-বা প্রথম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়? এ নিয়ে বহুজনের বহু মত রয়েছে, এমনকী ভারী ভারী বইপত্রে সেসব পড়াও যায়। কিন্তু নানা সংশয়ের ঘূর্ণিপাকে বিষয়টির মীমাংসা আজও হয়নি। প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এই নিবন্ধ।

লিখেছেন **একরাম আলি**

বাংলা সালের ইতিবৃত্ত

৬ পাতায়

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত একতিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ-এ অফিসার রমজান আলি

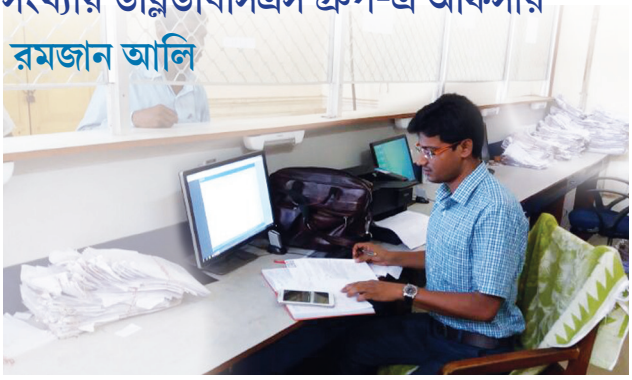

লিখেছেন **আসাদুল ইসলাম**

জীবনযুদ্ধে জয়ের সঙ্গী আল-আমীন

১৪ পাতায়

সাফল্য

মেডিকেলের স্নাতকোত্তরে আল-আমীনের প্রাক্তনীরা

প্রতি বছর আল-আমীন মিশনের বহু ছাত্র-ছাত্রী মেধা আর একনিষ্ঠ পাঠগ্রহণের ফলে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ অর্জন করে। এমন চিকিৎসকের সংখ্যা আজ অগুনতি, যারা আল-আমীনের প্রাক্তনী। বহু ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেলের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সফল হয়। শুধু ২০১৭ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সুযোগপ্রাপ্ত প্রাক্তনীদের পরিচিতি এই পাতায়। ১৮ পাতায়

বঙ্গাদর্শন

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। দুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। শুরু হল বঙ্গাদর্শন।

লিখেছেন **অশোককুমার কুণ্ডু**

২২ পাতায়

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

বিশ্ববিচিত্রা

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা।

লিখেছেন **ফরিদা নাসরিন**

৩১ পাতায়

ট্রোজান হর্স ▮ ডাকটিকিট ▮ হাইওয়ে

অন্যান্য বিভাগ

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
শিখরদেশ	২৬
রত্ন চতুষ্টয়	২৯
সাত-পাঁচ	৩৫
মিশন সমাচার	৪০
আমাদের পাতা	৪৭

যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান নিজের স্পর্শ দিয়ে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

— আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্, আয়াত ২৭৫ (অংশ)

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম। তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকী আমার মনে হল যে, সেই তৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম।' সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, 'হে রাসুলুল্লাহ্! আপনি এ-স্বপ্নের কী অর্থ করেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তা হল শিক্ষা।'

— সহিহ্ বুখারি শরিফ, সংখ্যা ৮২

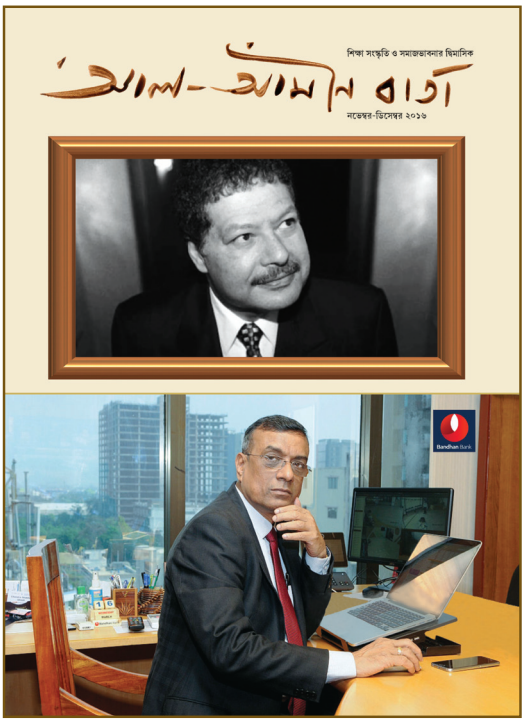

আত্মদীপ হয়ে ওঠার শিক্ষা

'আল-আমীন বার্তা' নিছক একটা স্কুল ম্যাগাজিন বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখপত্র নয় শুধু। তার বাইরেও বৃহত্তর অর্থে এর আরও উদ্দেশ্য আছে। আর তা আছে বলেই স্কুলপড়ুয়া বা আল-আমীনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষজন ছাড়াও বহু ব্যক্তি এই কাগজের বিষয়ে আগ্রহী। শুধু যেটুকু বলবার, তা নিশ্চয় 'আল-আমীন বার্তা'র সম্পাদকীয় বিভাগও ভাবছেন, আমাদের আরও নিবিড়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে হবে। এবং তার জন্য আরও আরও জানতে হবে নিজেকে, নিজের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেইসঙ্গে পূর্বাপর আরও বহু কিছু, যা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেসব বিষয়েও জানতে উৎসুক হতে হবে। এর ভেতর দিয়েই হয়তো আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে। যা আমাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করবে। এ-ব্যাপারে যে 'আল-আমীন বার্তা' সচেতন, তা প্রকাশিত রচনাবলির বেশ কিছু অংশে চিহ্নিত। এই সূত্রে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যার একটি লেখার কথা উল্লেখ করা যায়। পুনর্মুদ্রণ হলেও নিবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে আমাদের প্রস্থানবিন্দুটিকে যেভাবে আলো ফেলে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন, যাকে আমাদের লিগেসি হিসেবে জানতে পেরে গর্ববোধ করা যায় বই কী। কিন্তু এই ইতিহাসের গরিমায় মগ্ন থাকলে কী লাভ। আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেইও, তবে কিনা আত্মদীপ হতে আরও সাধ্যসাধন করতে হবে। প্রাচ্যের জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে (কথাটির সরল অর্থ অনভিপ্রেত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ের অধিকারের বিষয়, তবু প্রাচ্যের জ্ঞান ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আসলে প্রতিনিধিত্বের উপাধি।) মেলাতেই হবে, নচেত মানুষের সার্বিক মঙ্গল অসম্ভব, মুক্তিও কল্পনাতীত। এই কাজে 'আল-আমীন বার্তা'ও শরিক।

মনিরুল হক। শান্তিপুর নদিয়া

আধুনিক মনের প্রত্যাশা

'আল-আমীন বার্তা'র নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যাটি পড়ে এই চিঠি লিখতে বসলেও, যেকোনো সংখ্যা সম্পর্কে খাটতে পারে এমন একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কথাটি বলবার প্রবৃত্তি জাগছে মূলত আধুনিক মনের প্রত্যাশা থেকে। আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বে বিদ্যাচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রেই তথ্যের চাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশ্লেষণকে। কারণ, এতদিনে আমরা নিশ্চয় অনুধাবন করতে পেরেছি, তথ্য একটা বিষয় সম্পর্কে কিছু জানতে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু বিশ্লেষণ মননের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যা আমাদের চিন্তাশীলতা বাড়ায়, যা আমাদের ভাবনায় কখনো সংঘর্ষ কখনো সংগতি এনে তাকে আরও সম্পন্ন ও নৈর্ব্যক্তিক করে। সব চাইতে বড়ো কথা, যেকোনো বিষয়ের যে নানান মাত্রা থাকতে পারে, সে-সম্পর্কে উৎসুক করে তোলে। না বলে উপায় নেই, 'আল-আমীন বার্তা'য় এরকম লেখা থাকে না বললেই চলে, যা এই পত্রিকার পড়ুয়াদের সমসাময়িক চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে ভূমিকা নেবে, যখন এই পত্রিকার পাঠকদের বৃহত্তম অংশই স্কুল স্তরের পড়ুয়া। এই সূত্রে গত সংখ্যায় একটি লেখা, 'যত্নে মোড়া ক্লাসঘর' (লেখক একরাম আলি)-এর দ্বিতীয় কিস্তি যে আশান্বিত করল, তা স্বীকার করা জরুরি। লেখাটিকে আগাগোড়া চালনা করেছে চিন্তা ও বিচারবিশ্লেষণপ্রবণ মন। নিছক বুদ্ধির কাজ নয়, লেখাটি গড়ে উঠতে ভাবুকতার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ওই একটিমাত্র। তবে বলা প্রয়োজন, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপকথার গল্প ভাষা ও শৈলীর গুণে মূল্যবান। এ-পত্রিকার 'আমাদের পাতা'র লেখাগুলি অনেক ভালোবাসার দাবিদার। এদের হাতেই তো আমাদের সমস্ত ভরসার সম্পদ ধরা আছে।

আনোয়ার হাসেন। তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর

নিখিল সমাজের স্বপ্ন

সব সংখ্যার মতো 'আল-আমীন বার্তা'র নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যাটিও বহু মূল্যবান রচনায় সম্পন্ন। কাগজটির সব থেকে বড়ো গুণ— এর দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষতা। 'আল-আমীন বার্তা' আল-আমীন মিশনের মুখপত্র। তবু সে কেবল নিজের অন্দরে পড়ে নেই। তার দৃষ্টি বাইরের দিকেও প্রসারিত। সে ঘর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এক নিখিল সমাজের স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্নপূরণের জন্য তার অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে আল-আমীন। সেই অগ্রগমনের খবর পাই বার্তার 'মিশন সমাচার' বিভাগ থেকে। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী', 'শিখরদেশ', 'রত্ন চতুষ্টয়' পিছিয়ে পড়া সমাজের বহু ছেলে-মেয়ের কাছে অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে যারা নানান কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগতে ভুগতে সম্ভাবনা থাকার পরেও দিশেহারা। তারা হয়তো এসব বিভাগে বর্ণিত ছেলে-মেয়েদের কথা জেনে আবার নতুন করে উঠে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করতে পারবে। ডা. নার্গিস মোল্লার ছাত্রীজীবনের কাহিনি পড়ে শুধু পড়ুয়া কেন, যেকোনো মানুষ আশাহত অবস্থা থেকে আবার আশায় বুক বেঁধে নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন। এই স্বপ্ন দেখানোর কাজে 'আল-আমীন বার্তা'র ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই।

মহম্মদ গালিব। বাগনান হাওড়া

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যার 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগের লেখায় ডা. সুমিতা দাসকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ডা. সুমিতা দাস কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী। পেশাগতভাবে সরকারি চিকিৎসক।

আমরা যা-কিছুই শিখি, শিখি ভাষার মাধ্যমে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা তাই আবশ্যিকভাবে ভাষাশিক্ষা। বাংলা শুধুমাত্র এ-রাজ্যের ভাষা নয়, একটি উন্নত এবং সারা দুনিয়ার নিরিখেই প্রথম শ্রেণির ভাষা। রাজ্যের সব স্কুলে তাই বাংলাভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ইংরেজি বা অন্য ভাষাশিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য বা অবহেলা প্রকাশ করা হয়নি। বরং কতিপয় শিক্ষাঙ্গনে বাংলাভাষার দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ পথটি অর্গলমুক্ত করবার সদুদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এই সিদ্ধান্তে। শৈশব থেকেই একাধিক ভাষাশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে। শিক্ষাদপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

একটা জাতির নিজস্ব ভাষা থাকলে আরও বহু কিছু থাকে। যেমন বাঙালির আছে সেই ভাষার সাহায্যে লিখে নিজের মতামত প্রকাশের সামর্থ্য। আছে নিজেদের মতো বর্ষগণনার পদ্ধতিও, যার নাম বঙ্গাব্দ। এই বঙ্গাব্দ নিয়েও রয়েছে নানা মত, নানা তর্ক। ঠিক কবে, কার উৎসাহে এবং পদ্ধতি মেনে শুরু এই বঙ্গাব্দের? আমরা যে নববর্ষ বরণের ক্ষণে সমবেত কণ্ঠে গাই— 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো', আমাদের সেই আবেগপূর্ণ কণ্ঠসুর কোনো বিজ্ঞানকে ছুঁয়ে আছে কি? বাংলা বর্ষগণনার শুরুর ইতিহাস এবং ক্রমে কী করে একদিন সেই নিজস্ব বর্ষবরণের দিনটি জাতীয় উৎসবের রূপ পেল, এই সংখ্যায় সেসবের ইতিবৃত্ত রয়েছে একটি লেখায়।

মহামতি আরিস্ততলের একটি বিখ্যাত উক্তি: শিক্ষার শিকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল খুব মিষ্টি। আমরা সবাই জানি কথাটি। বিশেষ করে আল-আমীন মিশনের শুরুর দিনগুলির কথা মনে পড়লে মনীষীর ওই উক্তিটি আজও জ্বলজ্বল করে। এখানে শিক্ষার সঙ্গে আল-আমীনকে একাত্ম করে ফেললাম। দীর্ঘ একতিরিশ বছরের জড়িয়ে থাকাই এর কারণ। নিরলস কর্মীদের অহমিকা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। সারা বাংলায় ষাটোর্ধ্ব শাখা আল-আমীনের। প্রায় সব শাখাই গ্রামে বা আধাগ্রামে। পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছাকাছি। যে-বাংলা জুড়ে এত এত শাখা, সেটি কেমন বাংলা, তার মানুষজন কেমন, কেমনই-বা তাঁদের জীবনযাত্রা, চেতনার কোন স্তরে রয়েছেন তাঁরা? সেই গ্রামবাংলাকে চিনতে এই সংখ্যা থেকে শুরু হল একটি ধারাবাহিক রচনা— বঙ্গদর্শন। আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে।

'আল-আমীন বার্তা'র সকল পাঠককে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বাংলা সাল গণনার শুরু কবে থেকে? বঙ্গাব্দ শব্দটিরই-বা প্রথম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়? এ নিয়ে বহুজনের বহু মত রয়েছে, এমনকী ভারী ভারী বইপত্রে সেসব পড়াও যায়। কিন্তু নানা সংশয়ের ঘূর্ণিপাকে বিষয়টির মীমাংসা আজও হয়নি। প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন

একরাম আলি

বাংলা সালের ইতিবৃত্ত

বছর কয়েক আগে একটা দরকারে তাঁর জন্মসাল জানতে চাওয়ায় বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাবা বলতেন, সেই যে-বার ভয়ংকর বন্যা হয়েছিল, ঘরবাড়ি সব ভেসে গিয়েছিল, সে-বছরই আমার জন্ম।

এ-কথা বলার পর অবশ্য তাঁর জন্মসালটি তিনি বলেছিলেন। সেইসঙ্গে প্রশ্নকর্তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কয়েক হাজার বছর অতীতে। কোনো-এক বড়ো ঘটনাকে মনে রেখে মানুষের সময় মাপার প্রাচীনতম পদ্ধতিতে।

পরে, আকাশের দিকে বহু বছরের অবাক দৃষ্টি ঘুরিয়ে মানুষ প্রথমে চাঁদ আর সূর্যকে চিহ্নিত করে। হয়তো-বা খালি চোখে দেখা যায় বলেই। ক্রমে গ্রহ আর কিছু নক্ষত্রকেও চিনতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই যে চাঁদ আর সূর্যকে প্রথম চিনেছিল, সেই জ্ঞান আজও ভোলেনি। পরে সময় মাপার ক্ষেত্রে সবার আগে তার হিসেবে আসে মাথার ওপর জ্বলজ্বল-করা চাঁদের আর সূর্যের উদয়-অস্তের কথা।

নিজের কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের প্রদক্ষিণ করার সময়টিকে মানুষ মাপ হিসেবে নিয়েছিল। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করাটাও ছিল আর-একটা মাপ। চাঁদ না কি সূর্য, কার প্রদক্ষিণের মাপ সে গ্রহণ করবে? কাছের বলেই হয়তো অগ্রাধিকার পেয়েছিল চাঁদ। সুমেরীয় সভ্যতায় সময় গণনার পরিমাপক ছিল চাঁদ। এবং তারা বছরের একটা কাঠামোও তৈরি করতে পেরেছিল। বছরটিকে ভাগও করেছিল ঠিক বারোটা মাসে, যা আজও আমরা মেনে চলি। সেটাই ছিল সম্ভবত বর্ষগণনার প্রাচীনতম নিদর্শন। তাদের মাসগুলোর একেকটা নামও ছিল। যেমন— নিসান্নু, আইয়ারু, সিমান্নু, দিউজু, আবু, উলুলু, তাসরিতু, আরাহ্‌সামনা, কিসিলিমু, তেবেতু, সাবাতু, আদ্দারু। পয়লা নিসান্নু বসন্তকালের প্রথম দিন ছিল তাদের নববর্ষ। প্রায় চার হাজার বছর আগে ইরানিরা সুমেরীয় বর্ষগণনার পদ্ধতিকে সংস্কার করে সৌরবর্ষের রূপ দেয়। কেননা, সূর্যই ছিল তাদের প্রধান উপাস্য। এবং ঊষর ব্যাবিলনের তুলনায় ইরান ছিল সুজলা-সুফলা, কৃষিভিত্তিক একটি দেশ। চান্দ্রবর্ষে কৃষিকাজের হিসেব রাখা ছিল শক্ত। তুলনায় প্রাকৃতিক ঋতুগুলি সৌরবর্ষের হিসেবে একই সময়ে আসে। কেননা, চান্দ্রবছর সৌরবছরের চেয়ে এগারো-বারো দিন কম হয়। সৌরবছর হয় ৩৬৫ দিনের, আর চান্দ্রবছর ৩৫৪ দিনের। এ-কারণে চান্দ্রবছরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। চাষাবাদ বা ঋতুনির্ভর কাজকর্মের অসুবিধা হয়। তবে এনসাইক্লোপেডিয়া ইরানিকা জানাচ্ছে, সুমেরীয় বছর যেমন শুরু হত বসন্তকালে, ইরানি বছরও শুরু হল সেই বসন্তকাল থেকেই। চার হাজার বছর ধরে বছরের শুরুর দিনটি, অর্থাৎ পয়লা ফাওয়ারদিন, ইরানিরা তাদের নববর্ষ, যেটি নওরোজ নামে খ্যাত, অদ্যাবধি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে আসছে। বহুবার অদলবদল হলেও ক্যালেন্ডার আজও সৌরবর্ষকেই অনুসরণ করে।

মজার ব্যাপার হল, ভারতে যখন খ্রিস্টাব্দ শুরুর আটাত্তর বছর পরে, অর্থাৎ আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে, বর্ষগণনা শুরু হল শকাব্দ নামে, সেটিরও প্রথম মাস পয়লা চৈত্র। অর্থাৎ বসন্তকাল। 'এক্সপ্ল্যানাটরি সাপ্লিমেন্ট টু দি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যালামানাক' (সম্পাদক: পি কেনেথ সেইডেলমান) জানাচ্ছে, প্রাচীন ভারতে এটিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ক্যালেন্ডার। শকাব্দও ছিল সৌর-ক্যালেন্ডার।

শকাব্দের উৎস নিয়ে ইতিহাসবিদদের একাধিক মত আছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইতিহাসবিদদের মতে, প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি শালীবাহনের প্রয়াণদিবস থেকেই শকাব্দের সূচনা। কেউ কেউ বলেন, রাজা শালীবাহনের রাজত্বকালে একবার বহিরাগত শক জাতি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। তখন শালীবাহন শকদের পরাজিত করে শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। সেই থেকেই এই অব্দের নাম হয় শকাব্দ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শকাব্দকে নিখুঁত করার চেষ্টা হয়। এর মাস এবং দিনাঙ্ক নির্ধারিত হয় ওই সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির রচিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিষয়ক গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্তে'র সৌরবর্ষ গণনার বিধি মান্য করে। অর্থাৎ রবিসংক্রান্তি অনুসারে।

সৌরমাস নির্ধারিত হয় সূর্যের গতিপথের ওপর ভিত্তি করে। সূর্যের ভিন্ন অবস্থান নির্ণয় করা হয় আকাশের অন্যান্য নক্ষত্রের বিচারে। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের অবস্থান অনুসারে আকাশকে বারোটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এর একেকটি ভাগকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন রাশি। আর বারোটি রাশির সমন্বয়ে যে পূর্ণ আবর্তনচক্র সম্পন্ন হয়, তার নাম রাশিচক্র।

এই রাশিগুলোর নাম— মেষ রাশি, বৃষ রাশি, মিথুন রাশি, কর্কট রাশি, সিংহ রাশি, কন্যা রাশি, তুলা রাশি, বৃশ্চিক রাশি, ধনু রাশি, মকর রাশি, কুম্ভ রাশি আর মীন রাশি। সূর্যের বার্ষিক অবস্থানের বিচারে, সূর্য কোনো-না-কোনো রাশির ভিতরে অবস্থান করে। সূর্য যখন একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে যায়, তখন তাকে সংক্রান্তি বলে। এই হিসেবে এক বছরে বারোটি সংক্রান্তি পাওয়া যায়। একেকটি সংক্রান্তিকে একেকটি মাসের শেষ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়।

শকাব্দ ছাড়াও অনেক অব্দের প্রচলন ভারতে বহু শতাব্দী ধরেই রয়েছে। আঞ্চলিক সেইসব অব্দ থাকলেও শকাব্দের প্রচলনও ছিল সারা ভারতে।

পোড়ামাটির সুমেরীয় ক্যালেন্ডার।

নাম যা-ই হোক, দেখা যাচ্ছে, বছরকে বারো ভাগে বিভক্ত করবার পদ্ধতিটি সেই সুমেরীয় সভ্যতা থেকেই চলে আসছে, যদিও সুমেরীয়দের বর্ষগণনার পদ্ধতি ছিল চাঁদের হিসেবে।

কিন্তু, বঙ্গাব্দের প্রচলনটা হল কখন?

কেউ কেউ বলেন বঙ্গাব্দের প্রচলন শকাব্দের ঠিক ৫১৫ বছর পরে। সম্রাট আকবরের আমলে। এখনও পর্যন্ত এটাই অধিক মান্য পেয়েছে। এই তথ্যটিকে আমরা একটু নেড়েচেড়ে দেখব।

আগে দেখি বঙ্গ শব্দটিকে।

'ঐতরেয় আরণ্যকে' সর্বপ্রথম মগধের সঙ্গে বঙ্গ নামের একটি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' (২/১/২)। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে'ও একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে, যারা আর্যসভ্যতার সীমার বাইরে কলিঙ্গের পাশেই বসবাস করত।

'ঐতরেয় আরণ্যক'টি ঐতরেয় মুনি প্রণীত। এটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। তবে সে-উল্লেখ সুখকর নয়, বরং অপমানজনক। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র বঙ্গ বিষয়ক শ্লোকটি এরকম:

ইমাঃ প্রজা স্তিস্রো অত্যায়ায়ায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্বের পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিস্র ইতি।। (২/১/১)

অর্থাৎ, বঙ্গাদেশবাসীগণ, বগধবাসীগণ এবং চের জনপদবাসীগণ, এই ত্রিবিধ প্রজাই কী দুর্বলতা, কী দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চেটক ও পারাবত সদৃশ! 'ঐতরেয় আরণ্যক' রচনাকালে বৈদিক আর্যরা বগধ (মগধ?), চের এবং বঙ্গবাসীকে 'পাখির মতো অস্ফুটভাষী যাযাবর' মনে করত।

ঐতরেয় মুনির পর বঙ্গ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করেন আর্য ঋষি বৌধায়ন। ইনি 'কল্পসূত্র' লিখেছিলেন। তারই অন্তর্গত 'ধর্মসূত্রে' বৌধায়ন লেখেন: 'যিনি বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণূন (!) দেশ ভ্রমণ করবেন, তাঁকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করতে হয়।' অর্থাৎ বঙ্গে যে যাবে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

'মহাভারতে' বঙ্গ নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, কলিঙ্গ— এই পাঁচটি দেশকে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের নিকটবর্তী দেশ (৬/৯)। 'মহাভারত' অনুসারে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একই বংশের সন্তান। এঁরা ছিলেন মগধের অধিবাসী গৌতম দীর্ঘতম ঋষির ঔরসজাত এবং বলি রাজার দত্তক পুত্র (১:১০৪)। বঙ্গাদেশের রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (৪/১৭) (৬/৯৩)। 'মহাভারতে' এ ছাড়াও বহু প্রসঙ্গে এসেছে বঙ্গের নাম। তবে এইসঙ্গে বলতে হয়, প্রাচীন যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ— এই দেশ তিনটিকে ভারতবর্ষের বাইরের দেশ বলে গণ্য করা হত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে একটি সর্বপ্রাচীন ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে। বলা হয়েছে, যে-অঞ্চলটিতে উৎকৃষ্ট মানের সাদা ও নরম সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হত।

বাঙ্গাকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং।
পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণি স্নিগ্ধং।। (২/১১/১৭)

মহানিদ্দেশ (আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) এবং মিলিন্দপনহো (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বতীয় শতক) অনুযায়ী বঙ্গের অন্তর্গত এলাকা সমুদ্রতীরবর্তী ছিল বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শুধু বঙ্গ নয়, সঙ্গে সমতট, সুহ্ম, হরিকেল, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড় নামেরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে একই সময় থেকে। কখনো কোনো এলাকা প্রসিদ্ধ হলে সেই এলাকার নামেই পরিচিতি পেয়েছে সমগ্র বাংলা।

উপরোল্লিখিত সব তথ্যানুযায়ী বঙ্গ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় একটি দেশ, যা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কেউই এর নিশ্চিত অবস্থানের ইঙ্গিত করেননি।

এসবই শাস্ত্রকথা। আর্যদের আসার পরেকার ব্যাপার। কিন্তু তার আগে কী ছিল? আর্যরা যে-যুগে বাংলাভূমিকে অপবিত্র জ্ঞান করত, সেই যুগে কারা বসবাস করত বাংলায়?

প্রায় সমস্ত সূত্র জানাচ্ছে, পণ্ডিতরাও এ-বিষয়ে এক মত যে, বাংলার আদি মানুষ ছিল অস্ট্রোলয়েড জাতি। পরে কখনো এসেছে দ্রাবিড়রা। উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে এসেছে সিনো-টিবেটানরা। এসে সবাই মিশে গেছে।

অস্ট্রোলয়েড জাতির উপাস্য দেবতা ছিল বোঙ্গা। এই বোঙ্গা দেবতার নাম থেকেই বঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি বলে কারও কারও ধারণা। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি বং অথবা বাং নামক একটি দ্রাবিড়ভাষী উপজাতি বা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বং জাতিগোষ্ঠী কত খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, আজও জানা সম্ভব হয়নি। তবে দ্রাবিড় জাতির চিহ্ন বাঙালি জাতির আর বাংলা ভূখণ্ডের গায়ে প্রকটভাবে ছড়িয়ে রয়েছে আজও। দক্ষিণী সূত্র থেকে উদাহরণ হিসেবে ধ্বনিসাযুজ্যের কথা মনে রেখে আমরা বলতে পারি বেঙ্গালুরু, বঙ্গারু এবং এরকম প্রচুর অধুনাপ্রচলিত দ্রাবিড় শব্দের কথা।

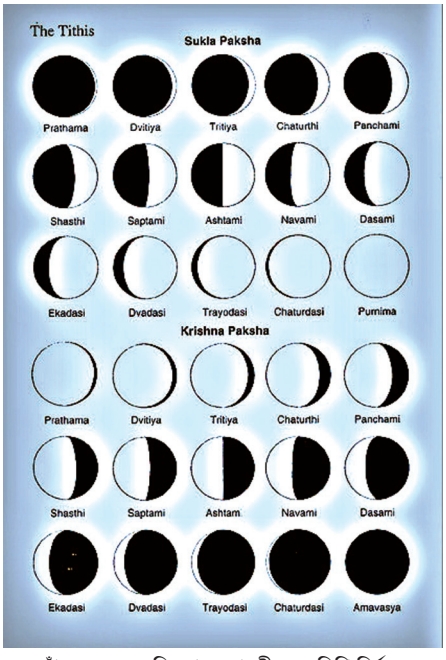

চাঁদের ক্ষয় ও বৃদ্ধি থেকে ভারতীয়দের তিথি নির্ণয়।

তবে বঙ্গ, বেঙ্গালা, বাঙ্গালা শব্দগুলোর আদি উৎস আজ উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব। একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু দেশটা তো রয়েছে আর রয়েছে তার অধিবাসীরা।

এই যে মিশ্র জাতির দেশ, এরই ওপর নজর পড়ল আর্য জাতির। ততদিনে তারা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেছে। পশ্চিম এবং উত্তর ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে দ্রাবিড়দের। অস্ট্রোলয়েডদেরও। একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করে নতুন এক মিশ্র সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এবং পাকাপোক্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের পর আশপাশের ভূখণ্ডগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

প্রত্নকথা

প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, সুহ্ম, রাঢ় প্রভৃতি যেসব দেশের নাম আমরা পাই, সমস্তই এই পর্বের। অথচ, আর্যরা আসার আগে এই উপমহাদেশে প্রাচীনতম সভ্যতার যে-বিকাশ হয়েছিল হরপ্পায়, সেই পর্বের সভ্যতার বহুল প্রমাণ রয়েছে বাংলায়— সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, অজয় আর ময়ূরাক্ষী নদীর অববাহিকায়। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে, ভেদিয়ার কাছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, বীরভূমের মহিষদল গ্রামে, পুরুলিয়ায় এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক জায়গায়। অন্তত সাড়ে চার হাজার বছরের সভ্যতার পাথুরে প্রমাণ রয়েছে এই ভূখণ্ডের। তারও হাজার হাজার বছর আগের প্লাইস্টোসিন যুগের যেসব হাড়ের তৈরি আয়ুধ পাওয়া গেছে বাংলার মালভূমি অঞ্চলে, সে-প্রসঙ্গ তুললে বলতেই হয়, মানবসভ্যতার আদিম রূপের বিকাশও এই মাটিতে হয়েছিল। এমন এক ভূখণ্ডের লোকজন বর্ষগণনা করতে জানত না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

মায়া সভ্যতার পঞ্জিকা।

যেমন দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতা। যত অবৈজ্ঞানিক হোক, তাদের একটা পঞ্জিকা ছিল। মানুষের গড় আয়ু ৫২ বছর ধরে ১৮ হাজার ৯৮০ দিনের একটি পঞ্জিকাচক্র ব্যবহার করত তারা। এই সময়ের বাইরের ঘটনার হিসেব রাখতে ৫১২৬ বছরের একটি অধিপঞ্জিকা তৈরি করে, যার শুরু খ্রিস্টপূর্ব ৩১১৪ সালে এবং শেষ এই ২০১২ সালে। তাদের ধারণা ছিল, ২০১২ সালের ২১ ডিসেম্বর সময় শেষ হয়ে যাবে। অনেকের ধারণা, ওই দিন নতুন সময়ের শুরু হওয়ার কথা। ২০১২ পেরিয়ে গেছে। সময় ফুরিয়ে যায়নি। তবু তাদের একটা অব্দ ছিল, যেমন ছিল গ্রিকদের। গ্রিকদের বছর ১০ মাসের। ৩০৪ দিনের সেই বছর শুরু হত মার্চ মাস থেকে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসদুটোর অস্তিত্ব ছিল না। মিশরে অবশ্য ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরোনো সৌর-অব্দ ছিল। কেউ কেউ বলেন, সৌর-অব্দটি আরও প্রাচীন। বারো মাসের, চার ঋতুর এই অব্দের মাসগুলো ছিল ৩০ দিনের, কিন্তু কোনো নাম ছিল না। বছরের শেষে ৫ দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনের বছর হত। লুব্ধক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আরও একটি অব্দ ছিল মিশরের। কিন্তু, প্রাক্-আর্য যুগের বাংলাকে নিয়ে পূর্ণ গবেষণা আজও হয়নি বলে আমরা জানতে পারছি না সেই যুগের সর্বাঙ্গীণ চেহারাটা। তবে অনুমান করতে পারি, যারা অলংকৃত মৃৎপাত্র তৈরি করে ব্যবহার করত, পয়ঃপ্রণালীযুক্ত শহর তৈরি করতে পারত, বিদেশে নৌবাণিজ্যে যেত (সুদূর ক্রিট দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ রয়েছে), তারা বর্ষগণনার একটা পদ্ধতি অবশ্যই আবিষ্কার করেছিল। আমরা সেটা জানতে পারছি না মাত্র।

বাঙ্গালা: খ্রিস্টীয় নবম শতকের শুরু

বাংলার আদিম কৌম সমাজের কথা নিশ্চিত করে জানা আজ বেশ শক্ত কাজ। ওই পর্বটিকে তাই ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়ব আদি ঐতিহাসিক যুগে।

গুপ্ত যুগের (৩২০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) অবসানের পর ছিন্নভিন্ন ভারতীয় উপমহাদেশকে একটা সাম্রাজ্যের দড়িতে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল অনেকগুলো রাজবংশ। পূর্বে পাল বংশ, উত্তর-পশ্চিমে প্রতিহার বংশ এবং দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটরাজ সাময়িকভাবে আংশিক সাফল্য পায়। এই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের একটি তাম্রলিপিতে ধর্মপালকে বঙ্গাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেশটিকে ভাঙ্গালা বা বাঙ্গালা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা বলছেন, যুদ্ধটি হয়েছিল ৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাইয়ের আগে। এটিই এ-পর্যন্ত পাওয়া প্রথম উল্লেখ, যেখানে স্পষ্টত বঙ্গ এবং বাঙ্গালা শব্দদুটি পাওয়া যায়। পরে ভেঙ্গালা, ভাঙ্গালা, পাংখোলা ইত্যাদি নানা রূপভেদ হলেও, বাঙ্গালা শব্দটিকে একাধিক সূত্রে আমরা পাই।

ষোড়শ শতকে ভারতকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করতে শেষমেষ সফল হয় মুঘলরা। বিশেষ করে বলতে হয় সম্রাট আকবরের কথা। তাঁর প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল ইবনে মুবারকের 'আইন-ই-আকবরি'তে ফের আমাদের ভূখণ্ডের উল্লেখ পাই 'বঙ্গালা', 'বঙ্গাল' নামে। সেই যে ভারতের রাষ্ট্রীয় বন্ধনে জড়িয়ে গেল বাংলা, ব্রিটিশরা সেই বাঁধনকেই আরও শক্ত করে তোলে। ফল হয় যে, আবুল ফজলের উল্লেখের পর থেকে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে প্রাচীন গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল, সুহ্ম, রাঢ় ইত্যাদি আর্য-উল্লেখিত দেশটির বা তার নানা অংশের নাম ত্যাগ করে গোটা ভূখণ্ডে বাঙ্গালা নামটিই ক্রমশ সর্বজনমান্য হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে একটা কথা মান্য পেয়ে গেল, যাকে আমরা বঙ্গাব্দ বলি, সেই বাংলা সালের চল শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। তিনিই নাকি বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন। ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখব।

বরাহমিহির থেকে মেঘনাদ সাহা

প্রথমেই বলে নিতে হবে, যে-সময়েই চালু হোক-না-কেন, বঙ্গাব্দের প্রকৃত উৎস হচ্ছে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত বরাহমিহিরের (জীবনকাল আনুমানিক ৫০৫ খ্রি.— ৫৮৭খ্রি., যদিও বহু মতভেদ আছে। বরং বলা ভালো, ষষ্ঠ শতক) 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি সংকলনগ্রন্থ। এতে গ্রিক, রোমান, মিশরীয় আর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং অনুমানগুলোর সার সংকলিত হয়েছে।

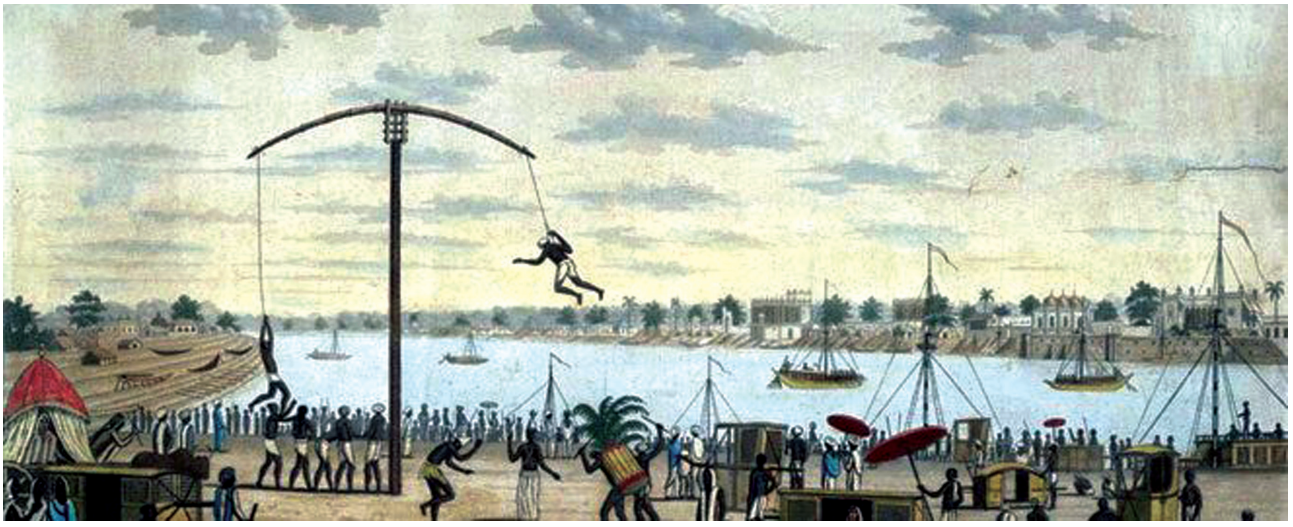

পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত এ-বইয়ে রয়েছে 'সূর্যসিদ্ধান্ত', 'রোমকসিদ্ধান্ত', 'পৌলিশসিদ্ধান্ত', 'পৈতামহসিদ্ধান্ত' ও 'বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত'। বরাহমিহির ছিলেন বর্তমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর রাজপুতানা নিয়ে গঠিত শকস্তানের বাসিন্দা। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এই সদস্যটি থাকতেন রাজধানী উজ্জয়িনীতে। রাজা শালীবাহনের শকাব্দকে তিনি প্রায় ৫০০ বছর পর সংস্কার করেন। চৈত্র মাসের বদলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ শুরুর নিয়মটির প্রবর্তক তিনিই। নক্ষত্রের নাম থেকে হয় মাসের নামগুলি। যেমন— বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া আর উত্তরাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভদ্রা থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, মৃগশিরা থেকে মার্গশীর্ষ (এই মাসটি বঙ্গাব্দে নেই। এর পরিবর্তে বঙ্গাব্দে আছে অগ্রহায়ণ। পরে এটি নিয়ে দু-কথা বলব।), পুষ্যা নক্ষত্র থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, উত্তরফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন, চিত্রা থেকে চৈত্র মাস।

কিন্তু দিনের নাম এসেছে গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রের নাম থেকে। যেমন— রবি এসেছে রবি অর্থাৎ সূর্য নামের নক্ষত্র থেকে। সোমবার এসেছে সোম অর্থাৎ চাঁদ, যা পৃথিবীর উপগ্রহ, থেকে। মঙ্গল এসেছে মঙ্গল গ্রহ থেকে। বুধ গ্রহ থেকে বুধবার। বৃহস্পতি গ্রহ থেকে বৃহস্পতিবার। শুক্র গ্রহ থেকে শুক্রবার এবং শনি গ্রহ থেকে এসেছে শনিবার।

তবে বরাহমিহিরেরও প্রায় দু-হাজার বছর আগে ভারতীয়রা বর্ষগণনা করতে জানত। যাকে এখন আমরা পঞ্জাঙ্গ বলি, সেই হিসেবেই তখন ছিল চালু। বরাহমিহিরের গণনার সঙ্গে সেই বর্ষগণনার কোনো মিল নেই।

১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে সেই বরাহমিহিরের পদ্ধতির সংস্কার হয়। উক্ত কমিটি শকাব্দকে ঋতুনিষ্ঠ ও সর্বস্তরে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতে এই অব্দ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। 'সূর্যসিদ্ধান্তে' উল্লিখিত নিরয়ণ বর্ষগণনারীতি পরিহার করে শকাব্দকে সায়ন সৌর-অব্দে রূপান্তরিত করে এবং বারো মাসের দৈর্ঘ্য স্থির করে দেয়। এ ছাড়া বার্ষিক গতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে অধিবর্ষে চৈত্র মাসে একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির ঘোষণা অনুসারে প্রত্যেক বছর মহাবিষুবের পরদিন অর্থাৎ গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির ২২ মার্চ শকাব্দ আরম্ভ হয় এবং শকাব্দের তারিখ অনুসারে সেই দিনটি হল পয়লা চৈত্র। কেবল অধিবর্ষে বর্ষারম্ভ হয় ২১ মার্চ।

তবে বঙ্গাব্দ শুধুই সৌর-অব্দ নয়। বর্ষগণনা সৌরমান অনুযায়ী হলেও, হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্ম পালন হয় চান্দ্রবর্ষের হিসেবে।

বঙ্গাব্দ শব্দের প্রথম উল্লেখ

এখনও পর্যন্ত যা তথ্য, বঙ্গাব্দ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার দুটি শিবমন্দিরে, উৎকীর্ণ লিপিতে। একটি ডিহর গ্রামে, অন্যটি সোনাতপন গ্রামে। বলা হয়, মন্দিরদুটির বয়স আনুমানিক হাজার বছর। এই তথ্য নিয়ে সংশয় আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনেকে মনে করেন, এই মন্দিরগুলি চতুর্দশ শতকের আগের নয়। তবু বিতর্ক থাকলেও এ-ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনর্বিচার একটু করতে হবেই।

সেটুকু কী?

বলা হয়, গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক থানেশ্বর জয় করে কর্ণসুবর্ণের সিংহাসন আরোহণ করেন ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে, যদিও এই সালটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য রয়েছে। রাজা শশাঙ্কের সিংহাসন আরোহণের বছরকেই বাংলা সনের আরম্ভ বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আর-একটি মত হচ্ছে, শশাঙ্ক সিংহাসনে উপবিষ্টের পর সৌরমান অনুযায়ী একটি নতুন সন চালু করেন, যাকে আজ আমরা বাংলা সন বলে অভিহিত করে থাকি।

আর-একটি মত হচ্ছে, গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

সরেশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির। ডিহর, বাঁকুড়া।

হিজরি সনে বাংলার শাসনব্যবস্থা চালানোর অসুবিধা দেখে চালু করেন বঙ্গাব্দ। এটিকে হুসেনি অব্দও বলা হয়। রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত বঙ্গাব্দকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে হিজরি সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই অব্দটি শুরু হয় হোসেন শাহের আমলে, যদিও শাহি দরবারে তখনও হিজরি সনেরও প্রচলন ছিল। এখানে উল্লেখ থাক, হোসেন শাহি স্বর্ণযুগে তিনি এবং পরে তাঁর পুত্র নুসরত শাহ নিজেদের পরিচয় দিতেন বাঙালি সুলতান হিসেবেই। পরে সম্রাট আকবরের সময় সেই কাজটিই আরও নিখুঁতভাবে হয়। অর্থাৎ হিজরি আর ভারতীয় সৌরবর্ষকে একসূত্রে গেঁথে বর্তমান বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয়। এটি কীভাবে হয়েছিল, আমরা দেখব। তার আগে দেখব, বঙ্গাব্দ এতটা প্রতিষ্ঠা পেল কী করে।

সেইসঙ্গে এখানে উল্লেখ থাক, শশাঙ্কের বাংলা সন প্রবর্তনের আগেও এই ভূখণ্ডে নানা সময়ে নানা সন চালু ছিল। সেগুলো হল— চন্দ্রাব্দ, গুপ্তাব্দ, শকাব্দ, বুদ্ধাব্দ, বিক্রমাব্দ, লক্ষণাব্দ প্রভৃতি।

এক. ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের তুর্কি বিজয়ের পর বাংলার গুরুত্ব নানা কারণে বেড়ে যায়। একটু একটু করে রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে বাংলার সুলতানরা একটা শক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্যোগী হন, যে-রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য— সুযোগ পেলেই দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর।

দুই. অর্থক্ষমতা। তুর্কিরা পৃথিবীকে আকাশের মতো বা স্বর্গের মতো সাত ভাগে ভাগ করেছিল। একেকটা ভাগকে বলত আকলিম বা ইকলিম। তাদের কাছে হিন্দুস্থান ছিল একটি আকলিম। আর হিন্দুস্থান নামক আকলিমের প্রথম বা প্রধান অংশ ছিল বঙ্গদেশ। আদিনা মসজিদ তৈরির সময় সেটাই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মসজিদ। বাংলার কোনো কোনো সুলতান কখনো এমন ঘোষণাও করেছেন যে, এমনকী আলাউদ্দিন হোসেন শাহও, তিনিই মুসলমান জাহানের খলিফা! তার অন্যতম কারণ, স্বাধীন হোক অথবা দিল্লির অধীন, সুলতানি আমল থেকে পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব ছিল সারা ভারতের সবচেয়ে বেশি, প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি। এমনকী, ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে টানা পঁচিশ বছর বিদ্রোহদমনে রাজধানীছাড়া, তখন আলিবর্দির পাঠানো খাজনা না গেলে ভারত ছিল অচল।

তিন. বাংলা ছিল বরাবরই স্বাধীনচেতা। আর্যপূর্ব যুগটি এখনও অন্ধকারে ঢাকা। তবে স্বাধীন যে ছিল, সন্দেহ নেই। আর্যপ্রাধান্য যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল, অবহেলা আর নীচু জাতের গঞ্জনা বর্ষিত হয়েছে বঙ্গবাসীর ওপর। বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়তো তখন থেকেই। মৌর্য আর গুপ্তযুগের শাসনের পর শশাঙ্ক থেকে ফের বাঙালির উত্থান। পালযুগ, সেনযুগের পর তুর্কিরা এসেও এই মাটির আহ্বান যেন ক্রমে শুনতে পেয়েছিল। তাদের প্রভু শামসুদ্দিন মহম্মদ ঘোরিকে ভুলতে এবং স্বাজাত্যপ্রীতি ছিন্ন করতে তুর্কিদেরও বেশি দিন লাগেনি। বার বার দিল্লির চাপ এসেছে, বার বার স্বাধীন হওয়ার এবং থাকার চেষ্টা করেছে বাংলা। সেই চেষ্টার পেছনে শুধুই কি ছিল নিজ সাম্রাজ্য গঠনের লোভ? মনে হয়— না। অনধিক চারশো বছরের এই চেষ্টার সমাপ্তি মুঘল আক্রমণে।

ফের স্বাধীনতা-স্পৃহার জন্ম উনিশ শতকে, ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায়। কিন্তু এই স্বাধীনতা-চেতনার চূড়ান্ত রূপ দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত। ভূখণ্ডের একাংশে হলেও হাজার হাজার বছরের স্বপ্নপূরণ হয়েছে বাংলাদেশ নামের এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মে। বঙ্গাব্দ সেখানে, সেই রাষ্ট্রের, সরকারি অব্দ।

আকবর? নাকি ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজি?

নানা মত থাকলেও বেশিরভাগ পণ্ডিত সম্রাট আকবরকেই বর্তমানে চালু বাংলা সনের প্রবর্তক বলে মনে করেন কেন? এমনকী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও? এঁদের যুক্তি হল: প্রথমত, সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তখন হিজরি সন ছিল ৯৬৩, সোমবার, ২৭ রবিউল আখির। এবং বাংলা সনও ছিল ৯৬৩ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয়ত, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে তারিখ-ই-ইলাহি অব্দ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে: 'আকবর বহুদিন ধরে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে (দিন গণনার) সমস্যা সহজ করে দেওয়ার জন্য এক নতুন বছর ও মাস গণনাক্রম প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি হিজরি অব্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। আমির ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজির প্রচেষ্টায় এ-অব্দের প্রবর্তন হল।'

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ অথবা ১১ মার্চ সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসার পর ক্রমে ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করে ফসলের মাধ্যমে সারা দেশে রাজস্ব আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই কাজটি করতে গিয়ে দরকার হয় ফসলি সনের, যাতে কৃষিকাজের সঙ্গে ঋতুগুলির মিল থাকে। আকবরের রাজত্বের উনতিরিশতম বছরে এই দায়িত্ব পালন করেন ইরানি জ্যোতির্বিদ আমির ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজি।

কে এই ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজি?

ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজি ইরানের সিরাজ শহর থেকে ভারতে আসেন সম্রাট আকবরের আমলে। 'তবাকাত-ই-আকবরী'তে আকবরের দরবারে ফতেহ্উল্লাহ্র আসার প্রথম দিনটির বর্ণনা রয়েছে। দিনটি তবাকাত-অনুযায়ী ৯৯১ হিজরির ২২ রবিউস সানি। খ্রিস্টাব্দ ১৫৮৩। বর্ণনাটি এরকম: 'এই সময়ে সৈয়দত্বের আধার, এই যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বর্তমান সময়ের জ্ঞানীগণের নেতা আমির ফতেহউল্লাহ, যিনি ছিলেন শিরাজের একজন সৈয়দ এবং অবরোহ সিদ্ধান্তমূলক ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, আর তিনি শিরাজ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন এবং আদিল খানের কার্যাবলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে ২২ শে রবিউস সানি রবিবার দিন ফতেপুর শহরে আনুগত্য প্রকাশের অনুমতি দান করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী খান খানান এবং হাকিম আবুল ফতেহ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হইয়া যান এবং তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করেন। আমির ফতেহউল্লাহকে সদরের (প্রধান বিচারক) মর্যাদাপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হয়।'

এ ছাড়া ফতেহ্উল্লাহ্ সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে, তিনি শুধু জ্যোতির্বিদই ছিলেন না, একাধারে ছিলেন নানা যন্ত্র-উদ্ভাবক, দার্শনিক, চিকিৎসক এবং গণিতবিদ। সম্রাট আবুল ফতেহ্ জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর তাঁকে আজুদ্দুদৌলা উপাধি দেন, যার অর্থ— সাম্রাজ্যের বাহু।

উদ্ভাবক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে বহু দিকে। এমন এক হাত-কামান তৈরি করেন তিনি, যেটি ছিল বহুনলবিশিষ্ট। একসঙ্গে ষোলোটি নল পরিষ্কার করতে পারে, কামান সম্পর্কিত এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যেটি চলত গোবুর সাহায্যে। সিরাজি শুধু যুদ্ধোপকরণই তৈরি করেননি, আবুল ফজলের অনুরোধে একটি যানও নির্মাণ করেন। প্রয়োজনে সেটি ভুট্টা পেষাইয়ের কাজ করতে পারত। সম্রাটের নির্দেশে খাজনা আদায়, আইন আর ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে একটি সঠিক কালপঞ্জি তৈরি করেন তিনি। ফারসি বর্ষপঞ্জি ছিল তাঁর নখদর্পণে। হিজরি আর শকাব্দের সংমিশ্রণ করে সৌরভিত্তিক যে বর্ষগণনা পদ্ধতি তৈরি করেন সিরাজি, সেটিই এখনকার বঙ্গাব্দ, যা আজও চলছে। তার আগে ছিল তারিখ-ই-ইলাহি নামে এক অব্দ, যা ফারসি সৌরবর্ষের ভারতীয় রূপ। সে-বর্ষের মাস এবং দিনের নাম ছিল ফারসি। পরে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অনুযায়ী এর মাস, বছর আর দিনের নামকরণ হয়। বঙ্গাব্দ সম্রাট আকবরের আমলের ২৯ বছরের মাথায় ১৫৮৪ সালের ১১ মার্চ প্রথম চালু করা হলেও, এর গণনা শুরু হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের দিন থেকে।

এ হেন ফতেহ্উল্লাহ্ সিরাজির মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়বেন আকবর, স্বাভাবিক। আবুল ফজল বলছেন, তাঁর প্রয়াণের পরে সম্রাট প্রায়ই বলতেন, তিনি ছিলেন আমার উকিল। তাঁর মৃত্যুর গুরুত্ব কেউই বোঝেনি। তিনি ছিলেন বহুমূল্য রত্ন। রাজকোষ শূন্য করেও তাঁকে কিনতে চাইলে সস্তাই হত তাঁর দাম।

সাল, সন, তারিখ

আমরা যে সাল শব্দটি ব্যবহার করি, সেটি ফারসি শব্দ। সন শব্দটি আরবি থেকে এসেছে। আর তারিখ শব্দটিও এসেছে আরবি থেকে।

কিন্তু প্রাচীন বঙ্গাব্দটি কেমন ছিল?

নীহাররঞ্জন রায় বলছেন, নবান্ন উৎসবই ছিল বাঙালির নববর্ষ উৎসব। ধানকেন্দ্রিক ভূখণ্ডে বছর শুরু হত খেত থেকে ধান বাড়িতে এলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নবান্ন উৎসবটি আজও সারা বাংলায় একই দিনে পালিত হওয়ার রেওয়াজ নেই। সবাই সবার বাড়ির উৎসবে যাতে অংশগ্রহণ করতে

বাঙালির হালখাতা।

পারে, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনরা যাতে যোগ দিতে পারে উৎসবে, তাই ভিন্ন ভিন্ন দিনে হয় নবান্ন। তাহলে? বিভিন্ন দিনে বর্ষ শুরু হবে কী করে?

কথা হচ্ছে, অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী নবান্ন পালিত হয়। মাসটি 'সূর্যসিদ্ধান্তে' ছিল না। ছিল মার্গশীর্ষ। বাঙালির কাছে মাসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংবৎসরের ফসল ওঠে এই মাসে। তাই নবান্ন। একসময় এই মাসটিতেই বাঙালির বছর শুরু হত বলে মনে হয়। অগ্রহায়ণ শব্দের আভিধানিক অর্থ— যেটি বছরের প্রথম মাস। অগ্র অর্থে প্রথম, হায়ন অর্থে বছর।

ভারতের ধানকেন্দ্রিক অঞ্চলে তথা দক্ষিণ এবং পূর্ব আর উত্তর-পূর্ব ভারতে নানা নামে পৌষসংক্রান্তি বা মকরসংক্রান্তি এক প্রধান উৎসব। এটিও ধান ঘরে তোলার পরের উৎসব। তাই সন্দেহ একটু থেকেই যায় যে, ওই দিনটিই বছরের শুরুর দিন ছিল না তো!

যা-ই হোক, পুরোনো প্রসঙ্গ বেশি না-টেনে বলা যায়— পঞ্চাঙ্গ, 'সূর্যসিদ্ধান্তে'র পর হোসেন শাহি পথ ধরে হিজরি আর প্রাচীন বঙ্গাব্দ মিলিয়ে এখনকার নতুন বঙ্গাব্দটি দাঁড়িয়ে গেছে শুধু নয়, এটি এক আবেগের জন্ম দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে, যদিও বাংলাদেশের বঙ্গাব্দের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বঙ্গাব্দের কিছু পার্থক্য রয়েছে। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে শকাব্দের সংস্কারে সচেষ্ট হন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা যেমন, তেমনই ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশেও বঙ্গাব্দ সংস্কার করা হয়। পয়লা বৈশাখ বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংশোধিত বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে দিনটি পড়ে প্রতি বছরের ১৪ এপ্রিল তারিখে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে সনাতন বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে

১৯৬৫ সালে রমণার এই ঐতিহাসিক বটমূলেই ছায়ানটের প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়, যা আজ বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকার নববর্ষবরণ।

দিনটি পড়ে ১৪ কিংবা ১৫ এপ্রিল। এটি পাশ্চাত্যের বর্ষপঞ্জির মতো নির্দিষ্ট নয়। ভারতের সমস্ত বঙ্গভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে সনাতন নিরয়ণ (জ্যোতির্মণ্ডলে তারার অবস্থানের প্রেক্ষিতে গণিত, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর প্রকৃত সময়ই নিরয়ণ বর্ষপঞ্জি। অর্থাৎ নিরয়ণ বর্ষপঞ্জির দৈর্ঘ্য হল ৩৬৫.২৫৬৩৬০২ সৌরদিবস, যা ক্রান্তীয় সায়ন বর্ষপঞ্জি থেকে ২০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড দীর্ঘ।) বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বর্ষপঞ্জি ক্রান্তীয় বা সায়ন বর্ষপঞ্জি (যেমন সংস্কারকৃত বাংলা সন এবং গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি) থেকে ভিন্ন। এই উভয় ধরনের বর্ষপঞ্জির মধ্যে সময়ের যে গাণিতিক পার্থক্য রয়েছে, তার কারণেই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নতুন বর্ষ শুরুতে দিনের পার্থক্য হয়। এই সময়ের পার্থক্যের কারণে নিরয়ণ সৌর-বর্ষপঞ্জিতে মাসের দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন পার্থক্য রয়েছে নববর্ষ উদ্‌যাপনের আন্তরিকতায়, উৎসাহে আর উদ্দীপনায়।

অবশ্য অতি সম্প্রতি এ-বাংলাতেও নববর্ষ উদ্‌যাপনে মানুষ পথে বেরোতে শুরু করেছে এবং আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতেই নববর্ষ একটি প্রধান উৎসবের গৌরব পাবে।

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো

বাংলাদেশ কীভাবে এই গৌরব অর্জন করল? বলতেই হবে, তাদের

জাতীয় সংকট থেকে। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (১৯৫৮—১৯৬৯) হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বাংলা-বিরোধী নানা ফরমান জারি হতে থাকে। বাঙালির সংস্কৃতির ওপর পুনঃপুন ফৌজি খড়্গাঘাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুববাংলা। নেমে আসে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা। এবং একই সঙ্গে সরব হয় মানুষের প্রতিবাদ। এমনই পরিস্থিতিতে জন্ম হয় ছায়ানট নামে একটি সংস্থার, যে-নামটি আজ বহুবিখ্যাত। আজকের বাংলাদেশে নববর্ষবরণের এই যে বিশাল উৎসব, এই উৎসবের প্রেরণা এসেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। কেমন করে?

ছায়ানটের বক্তব্য উদ্ধৃত করতেই হচ্ছে। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে: বাংলা ১৩৬৮, ইংরেজি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন করবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পাকিস্তানি শাসনের থমথমে পরিবেশেও কিছু বাঙালি একত্র হয়েছিলেন আপন সংস্কৃতির মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তির উৎসব করবার জন্য। তমসাচ্ছন্ন পাকিস্তানি যুগে কঠোর সামরিক শাসনে পদানত স্বদেশে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রভাবনা অবলম্বন করে ছায়ানট যাত্রা শুরু করে। সারাবিশ্বে শতবার্ষিকীর আয়োজন বাংলার এই প্রান্তের সংস্কৃতিসচেতন মানুষের মনেও চাঞ্চল্য জাগায়। বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী যেমন উদ্যোগী হলেন, তেমনি ঢাকার কিছু সংস্কৃতিকর্মীও আগুয়ান হল শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে। অগ্রাহ্য হল অনতি উচ্চারিত নিষেধ। সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সফল উদ্যোগ। শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবার পর এক বনভোজনে গিয়ে সুফিয়া কামাল, মোখলেসুর রহমান (সিধু ভাই), সায়েরা আহমদ, শামসুন্নাহার রহমান (রোজ বু), আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাকের 'ভীমরুল'), ওয়াহিদুল হক, সাইদুল হাসান, ফরিদা হাসান, সন্‌জীদা খাতুন, মীজানুর রহমান (ছানা), সাইফউদ্দীন আহমেদ মানিক-সহ বহু অনুপ্রাণিত কর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। জন্ম হয় ছায়ানটের।

ছায়ানট আপাতদৃষ্টিতে একটি সংগীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু

এমন একটি প্রতিষ্ঠানই ক্রমে হয়ে উঠল একটা জাতির জেগে ওঠার অন্যতম পতাকা।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির ওপর আক্রমণের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথেরই 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' গানটি গেয়ে ছায়ানট ১৩৭২ বঙ্গাব্দের (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) পয়লা বৈশাখ প্রথম নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু করে রমণা ময়দানের বটমূলে।

তারপর যতদিন গেছে, বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছে এই অনুষ্ঠান। স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীতির বিরুদ্ধে ও বাঙালি আদর্শের লালনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ পালিত হতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংস্কৃতি অঙ্গনে নববর্ষ উদ্‌যাপন বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলা বর্ষবরণ এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর কৃতিত্ব যেমন ছায়ানটের, তেমনই বাংলাদেশের অগণিত সংস্কৃতিকর্মীর— যাঁরা আসলে যোদ্ধা।

তাঁরা চেয়েছিলেন, দুই ধর্মের এই দেশে এমন একটা উৎসব চাই, যা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। প্রতিটি বাঙালির। এটা তাঁরা পেরেছেন শুধু নয়, পয়লা বৈশাখ সে-দেশের সবচেয়ে বর্ণময় একটি দিন। একটা অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও নববর্ষ বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব। সে-উৎসবের দিনটি রাজা শশাঙ্ক বা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বা সম্রাট আকবর নিয়োজিত আমির ফতেহ্‌উল্লাহ্‌ সিরাজি— যাঁর কৃতিত্বেই নির্ধারিত হোক-না-কেন।

এপারের বাঙালির জাতীয় উৎসব কী? দুর্গাপুজো। এখানে আমরা এক ধাপ পিছিয়ে রয়েছি বাংলাদেশের থেকে! আমাদের জাতীয় উৎসবে সবাইকে সামিল করতে পারিনি। বা এমন কোনো উৎসব খুঁজে নিইনি, যেটি প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন হতে পারে।

তাহলে কি আমাদের উত্তরণের কোনো আশা নেই? আছে। আর তার

বর্ণিল পতাকা এখন দেখা যাচ্ছে পয়লা বৈশাখের দিনটিতেই, সেদিনটির গায়ে যতই লেগে থাকুক-না-কেন ১৪ বা ১৫ এপ্রিলের ছোট্ট অস্বস্তির সংশয়টুকু।

সহায়ক রচনাপঞ্জি

- Panchasiddhantika of Varahamihira with translation and notes by T S Kuppanna Sastry, P P S T Foundation, Adyar, Madras, 1993
- A Concise review of the Iranian Calendar by M Heydari-Malayeri, Paris Observatory
- W Hartner, 'Old Iranian Calendar' in Cambridge History of Iran-III, 1985
- The Indian Calendar, https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/calendars
- Clarence-Smith, William Gervase, Science and technology in early modern Islam, c. 1450– c.1850, Global Economic History Network, London School of Economics
- Nitish K Sengupta, Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib, Penguin Books India, 2011, ISBN 978-0-14-341678-4
- Kunal Chakrabarti Shubhra Chakrabarti, Calendar, Historical Dictionary of the Bengalis, Scarecrow Press, 2013, ISBN 978-0-8108-8024-5
- নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১
- দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
- পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১
- অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পাল অভিলেখ সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯২
- রাজমোহন নাথ, বি-ই, তর্কভূষণ, মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা, নাথ পাবলিশার্স, শিলং, ১৯৬১
- হিউয়েন সাঙ, অনুবাদ: যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, বৌদ্ধযুগের ভারত, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৬
- গোলাম হুসেন সলীম, রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, রিয়াজ-উস-সালাতিন, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭
- রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯
- অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭
- মমতাজুর রহমান তরফদার, অনুবাদ: মোকাদ্দেসুর রহমান, হোসেন শাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪—১৫৩৮): একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১
- খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ, অনুবাদ: আহমদ ফজলুর রহমান, তবাকাত-ই-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
- সুহৃদকুমার ভৌমিক, বাঙালির জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবিসম্প্রদায়, অস্ট্রিক, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১৪
- http://bn.banglapedia.org, পহেলা বৈশাখ, বাংলাপিডিয়া
- http://chhayanaut.org, জন্মকথা ■

গত একতিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ-এ অফিসার

রমজান আলি

জীবনযুদ্ধে জয়ের সঙ্গী আল-আমীন

আসাদুল ইসলাম

এবারের 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী'তে আমরা যাঁর কথা আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি, তাঁর নাম রমজান আলি। রমজান ক্রিয়াপদটির উৎপত্তি আরবি রমজ ধাতু থেকে, যার অর্থ দহন করা বা পুড়িয়ে ফেলা। কী পোড়ানো হয়? কাম, ক্রোধ, অহংকার— এমন সব অপগুণ, যা মানবিক উৎকর্ষ অর্জনের পথে বাধা দেয়। শুধু মানবিক উৎকর্ষ অর্জনের পথে বাধা দেওয়া নয়, মানবসম্পদের বিকাশকেও থামিয়ে দেয় এইসব অপগুণ। আধুনিক বিশ্বে জমি বাড়ি সোনাদানাকে নয়, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করা হয় মানবসম্পদকে। মানবসম্পদের যথার্থ বিকাশ হলে তা বহুমূল্য সম্পদ তৈরি করতে পারে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, নানা প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ বিকাশের নানা সহযোগী ব্যবস্থা। এইসব প্রথাগত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সঙ্গে কাম-ক্রোধ-অহংকার দহন করার মানবিক শিক্ষার পাঠই মানুষকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের দোরে। আল-আমীন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনী হিসেবে মিশনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ যে রমজানকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছিল, তা আপনারা অনুধাবন করতে পারছেন। অপগুণ দহন করে এগিয়ে যাওয়ার পাঠ কি তিনি নিতে পেরেছিলেন? রমজান নাম কি আদৌ প্রভাব ফেলেছে তাঁর জীবনে? যদি ফেলেই থাকে, তাহলে কীভাবে? এই দহন প্রক্রিয়ায় আল-আমীন মিশনের ভূমিকা কী— এসব জানার ইচ্ছে হলে, পাঠক, আপনাকে রমজান আলির জীবনের গল্প শুনতে হবে। এই জীবন-আলেখ্যে প্রবেশের আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি— রমজান আজ আমাদের ঘরে ঘরে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকেই রমজান মনে হবে। রমজানের সঙ্গে আমাদের ফারাক— অনেক ছেলে-মেয়ের ফারাক— তারা অপগুণের চক্রে পড়ে হারিয়ে যায়। মাত্র একটা ভুল, একবার পা পিছলে পড়ে যাওয়া, একটা জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আবার উঠে দাঁড়াতে গেলে যে-অবলম্বন দরকার হয়, তা সবাই পায় না, তাই সারা জীবনের জন্য হারিয়ে যায়। কিন্তু রমজান একটা অবলম্বন পেয়েছিলেন, সে-অবলম্বনের নাম আল-আমীন মিশন, তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। স্পর্শ করেছেন সাফল্যের চূড়া। চড়াই-উতরাই ভেঙে শীর্ষে আরোহণ করলেন কীভাবে, সেটাই এবার জেনে নিই।

গ্রীষ্মের সকালে রমজানের কথা শুনব বলে বসেছিলাম ওঁর সঙ্গে। সাতসকালে প্রায় ঘণ্টা খানেক ট্রেনযাত্রা উজিয়ে এসেছেন। কথা শুরুর আগেই রমজান আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমার একটা কথা আছে, এটা কিন্তু অবশ্যই লিখবেন— এনিওয়ান ক্যান বি এনিবডি অ্যাট আল-আমীন মিশন।' আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া যেকোনো উচ্চতায় পৌঁছোতে পারে। রোগা-পাতলা রমজানের মুখে এ-কথা শুনে কেউ ভাবতেই পারেন, ওঁর মাথার ঠিক আছে তো? কী বলছেন উনি, তার সঠিক অর্থ বোঝেন তো? যেকোনো উচ্চতায়— কথাটা কিন্তু হেলাফেলা করার মতো নয়। এটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু যিনি পরীক্ষায় ৪০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ১৩৮ পান, অনার্স নিয়েও তা রাখতে পারলেন না, সেই অবস্থা থেকে যদি ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-এ) আধিকারিক হয়ে উঠতে পারেন, সেই হয়ে ওঠায় যদি আল-আমীন মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে তাঁর কী মনে হতে পারে? বাড়িয়ে বলছেন মনে হচ্ছে কি আর? এ-প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না, যাই মনে হোক-না-কেন, সে-বৃত্তান্তে না

গিয়ে বরং আমরা অবিশ্বাস্য গল্পটাই শুনে নিই।

রমজান আলির বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামে। থানা, পোস্ট অফিস, গ্রাম— তিনটেই নবগ্রাম। নবগ্রাম ব্লকপাড়াতে বাড়ি। বহরমপুর থেকে খড়গ্রাম, নগর বা কান্দিগামী বাসে নবগ্রাম স্টপেজে নেমে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই ব্লকপাড়ায় পৌঁছোনো যাবে। গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বসবাস। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। কিছু মানুষ গ্রামকেন্দ্রিক ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন। চাষের মধ্যে ধান প্রধান। মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষ যেমন শ্রমনিবিড় কাজে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে বা বিদেশে চলে যান, সেই প্রবণতা নবগ্রামে দেখা যায় না। পড়াশোনার হার এখন ঊর্ধ্বমুখী হলেও পাড়ার বয়স্ক মানুষদের মধ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিছু কিছু পরিবার অবশ্য পড়াশোনার প্রতি যত্নশীল। যেমন রমজানদের পরিবার। রমজানের আব্বা মহম্মদ আমিরুল ইসলাম, বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি, গ্র্যাজুয়েট। যদিও চাষবাসই তাঁর জীবিকা। সম্বল ছ-সাত বিঘা ধানি জমি। রমজানের মা সামসুন নাহার নার্স। রমজানের দাদা হুমায়ুন কবীর বিএসসি করার পর ডিএমএলটি করে এখন ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে চাকরি করেন। দিদি নুরজাহান বেগম গ্র্যাজুয়েট, বিবাহিতা। পরিবারের ছোটোছেলে রমজান। রমজানদের গ্রামেই প্রাইমারি স্কুল। হাই স্কুল পাড়া থেকে এক কিলোমিটার দূরে। রমজান পড়াশোনা শুরু করেছিলেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে নয়, ওই হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলে। কারণ, ওই স্কুলে হিন্দু ছেলে-মেয়ে বেশি। প্রতিযোগিতা বেশি। পড়াশোনা ভালো হয়। নবগ্রাম প্রাইমারি স্কুল শেষে ভর্তি হয়েছিলেন নবগ্রাম হাই স্কুলে। কো-এড স্কুল। প্রাইমারির মতো হাই স্কুলেও রমজান বরাবর প্রথম হতেন। বুনিয়াদি শিক্ষালাভের এই স্তরে রমজান পড়াশোনার ভিতটা গড়ে নিয়েছিলেন। এই কাজে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছিলেন প্রবোধ মণ্ডলের থেকে। প্রবোধ মণ্ডল রমজানের টিউশন শিক্ষক ছিলেন। বিজ্ঞানের স্নাতক হাই স্কুলের শিক্ষক ওই মানুষটি অঙ্ক ও ফিজিক্স পড়াতেন। আশেপাশের স্কুলের ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলে-মেয়েরাই পড়ার সুযোগ পেত ওঁর কাছে। প্রবোধবাবু ভালো তো পড়াতেনই, তার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের মনে নানাভাবে স্বপ্ন এঁকে দিতে চাইতেন। অনুপ্রেরণা জোগাতেন। ক্লাস টেন পর্যন্ত রমজান এই একমাত্র স্যারের কাছেই পড়তেন। কোনোদিন টিউশনি কামাই করতেন না। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে একটা চাপা প্রতিযোগিতাও ছিল। মাধ্যমিকে ভালো ফলের পিছনে এটাই ছিল প্রধান কারণ। এ ছাড়া গ্রামের একটা ছেলে যেমন স্কুলে যায়, খেলাধুলা করে— সবকিছুই করেছেন রমজান। ২০০১ সালে রমজান মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিলেন ৬৬৪ নম্বর। ৮৩ শতাংশ। ব্লকের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। বিডিও ব্লকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করেছিলেন। রমজানকে উপহার দেওয়া হয়েছিল একটা অভিধান। রমজানই এখনও পর্যন্ত নবগ্রাম হাই স্কুলের মাধ্যমিকের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক। মাধ্যমিক পর্যন্ত রমজানের জীবন আর-পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মতোই। ঘটনার ঘনঘটা শুরু হয় মাধ্যমিকের পর।

রমজানের দাদা হুমায়ুন কবীর খোঁজখবর নিয়ে ভাইকে আল-আমীন মিশনে ভর্তির উদ্যোগ নেন। ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে খলতপুরে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হতে চাও?' রমজান হতে চাইতেন ডাক্তার, কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে স্যারকে বলেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ডাক্তার হননি। ইঞ্জিনিয়ারও না। বড়ো কথা, আল-আমীন মিশনে তাঁর থাকাই হল না। ভর্তি হয়ে পচিশ-ছাব্বিশ দিন থাকার পর তিনি ফিরে গেলেন। মিশনে মন বসাতে পারেননি। এর কারণ কী ছিল জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা তাৎক্ষণিক ভালোকেই মনে করে প্রকৃত ভালো, দীর্ঘমেয়াদি সময়ে যে-ভালো ফল হয়, তা নিয়ে বিবেচনা করে না, করতে পারে না। তাই অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।' কথাটা অনেকাংশেই ঠিক। মিশনে ভর্তি হওয়ার পর যে দু-একজন ছেলে-মেয়ে ফিরে যায়, তাদের মনোজগতে কী ঘটেছে কেউ জানতে পারে না। শুধু ফিরে যাওয়াটুকু চোখে পড়ে। ফিরে যাওয়া মানে সাফল্য লাভের দূরত্বটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। রমজানের জীবনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রমজানকে বাড়ির সকলে বোঝালেন। কিন্তু সেসব কথা কানে না নিয়ে ফিরে গেলেন। ভর্তি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম সেরা স্কুল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলে পড়ে বিত্তবান সম্ভ্রান্ত পেশার পিতা-মাতার সন্তানেরা। শিক্ষক-অধ্যাপক-চিকিৎসক বাবা-মায়ের সন্তানদের দলে কৃষক-পরিবারের রমজান আলি নাম লেখালেন বটে, পাত্তা পেলেন না। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মেশার বা আলোচনায় অংশ নেওয়ার মতো কোনো কমন টপিক থাকত না। ফলে একা হয়ে পড়েন। মুর্শিদাবাদের মতো জেলা, যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সদর শহরের ভালো স্কুলে তাদের উপস্থিতি শতকরা দু-তিন শতাংশ। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখ সবসময় ঘুরে বেড়ায় স্কুলচত্বরে। ফলে শুরু হয় হীনম্মন্যতায় ভোগা। রমজানের বার বার মনে হতে থাকে একটি প্রশ্ন— কেন মিশন ছেড়ে এলাম। ফিরবার পথ না পেয়ে মেসে থেকে স্কুলে কিছু দিন ক্লাস করার পর বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি থেকে পড়াশোনা করেই পরীক্ষা দেবেন ঠিক করলেন। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করার জন্য বহরমপুরই উপযুক্ত জায়গা। টিউশনের ভালো শিক্ষক আছে। বাড়ি ফিরে আসার পর সেসবও বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের স্কুলে বাসে যাতায়াত করে পড়াশোনায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হওয়া কঠিন, তা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। রমজানও ফল পেলেন হাতেনাতে। ২০০৩ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেলেন ৭০১ নম্বর। ৭০ শতাংশের মতো নম্বর বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। এরপর কী করবেন? রমজানের পড়াশোনায় বাড়ির লোক প্রথম থেকেই কোনোকিছু চাপিয়ে দেননি। রমজান যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বাড়ির সকলে তা সমর্থন করেছেন। ফলে ভুল করলে তা সংশোধন করার অলিখিত দায় ছিল রমজানেরই। আল-আমীন মিশন থেকে ফিরে যাওয়াটা তাঁর ভুল হয়েছে, এ-কথা সব সময় ভাবতেন। সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করলেন আল-আমীন মিশনের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার উদ্যোগের মাধ্যমে। কিন্তু রমজানের ভাগ্যাকাশে তখন গ্রহণ লেগেছিল, তাই ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারলেন না। রমজান এর জন্য ভাগ্যকে দোষ দিলেন না, বললেন, উচ্চ-মাধ্যমিকের দুর্বল পড়াশোনার জন্যই সুযোগ পাননি। এরপর নবগ্রাম থেকে কলকাতায় পাড়ি জমালেন। লক্ষ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে পাস করে ডাক্তার হওয়া। কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হলেন ফিজিক্স অনার্স নিয়ে। কিন্তু পড়াশোনা শুরু করলেন জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জন্য। এরকম অনেক

আল-আমীন মিশনে ডব্লিউবিসিএস কোচিং নেওয়া আবাসিক ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কলকাতার বারুইপুরে। ক্লাস পার্কসার্কাসে। ভর্তি-ফি, মাসিক বেতনে অনেকটা ছাড় পেয়েছিলেন। এই সুবিধা পাওয়ার থেকে বড়ো প্রাপ্তি হল পড়ার পরিবেশ পাওয়া, নিজেকে তৈরি করার ক্ষেত্র পাওয়া।

ছেলে-মেয়েই করে থাকে। যাতে জয়েন্টে সুযোগ না মিললে অনার্সটা অন্তত করা যায়। রমজান এসে দমদমের ঘুঘুডাঙাতে একটা মেসে থাকছিলেন। উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ার বছরেও, অর্থাৎ রানিং স্টুডেন্ট হিসেবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিলেন। কোনো র‍্যাঙ্ক হয়নি। কলকাতা এসে জয়েন্টের লক্ষ্যে পড়াশোনা করলেও কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি টাকার অভাবে। কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য এককালীন যে কুড়ি-তিরিশ হাজার টাকা দরকার, তা বাড়ি থেকে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। মা তখন অনেক কম বেতন পেতেন। চাষ থেকে যেটুকু আব্বা আয় করেন, তাও আহামরি কিছু নয়। বাড়িতে তখন তিন ভাই-বোনই পড়াশোনা করছেন। তার ওপর ওই সময় রমজানদের বাড়ি করার জন্য বেশ কিছু অর্থ খরচ হয়েছে। যদিও সেটা পাকাবাড়ি নয়। আগে রমজানদের দু-কামরার একতলা মাটির বাড়ি ছিল, সেটা ভেঙে টিনের ছাউনি দিয়ে একটু ভালো করে মাটির বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। পরের বছরও জয়েন্টে কোনো র‍্যাঙ্ক হল না রমজানের। এ-বছর আরও একটা কাণ্ড ঘটালেন রমজান। সিটি কলেজের পরিবর্তে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে নতুন করে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন। দমদমের পাট চুকিয়ে তালতলার বেকার হস্টেলে এলেন। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে থাকা-খাওয়া-পড়াশোনা করার টানে। দু-বছর পর, অর্থাৎ ২০০৬ সালে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল বের হতে দেখা গেল অনার্সের চারটি পেপারের ৪০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছেন ১৩৮। অনার্স ধরে রাখতে পারলেন না। টায়েটুয়ে পাস করলেন। কেন এমন হল? যে-ছাত্র ব্লক স্তরে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন, তাঁর এই অবনমন কেন? আনত মুখ তুলে সামান্য হাসলেন রমজান। হাসি ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগে যে অকপট স্বীকারোক্তি করলেন, তা আশা করিনি। আমরা সাধারণত এসব প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে যাই। সমাজের খুব কম মানুষই বুক-মুখের ফারাক ঘুচিয়ে ফেলতে পারেন। বেশিরভাগ মানুষ বুকে একরকম ভাবনা রাখেন, মুখে অন্যরকম কথা বলেন। দেখলাম, রমজান এখনও সেটা রপ্ত করতে পারেননি। সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে, তা সমাধান করা যায় না, অথচ অনেক ক্ষেত্রে সেটাই হয়। অলক্ষে প্রতিটা বাড়িতে সে থাবা বসিয়ে চলে। রমজান বললেন, পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার পিছনে দুটো জিনিস— এক, মোবাইল। দুই, একটা সম্পর্ক। দুই যুবক-যুবতীর সম্পর্কের বিস্তারিত বৃত্তান্তে যাচ্ছি না। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, সম্পর্ক শুধু সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎটাই অন্ধকার করে দেয় না, কাউকে কাউকে দাঁড় করিয়ে দেয় জীবনমৃত্যুর সীমানায়। যেমন দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল রমজানকে। পারিবারিক সহৃদয়তা আর মনোরোগের চিকিৎসায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন রমজান। পাড়া-ঘরের ঘটনা দেখে-শুনে আজ সকলের কাছে পরিষ্কার, এসব ঘটনার পিছনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রযুক্তির অপব্যবহার। বিশেষ করে মোবাইল। এই অনুঘটক প্রতিদিন কীভাবে সবার অলক্ষে সমাজের একটা বড়ো অংশকে ধীরে ধীরে খাদের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে, তা টের পেলেও সহজে বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকছে না। সহজে সম্পর্ক জোড়া লাগানো বা নিমেষে ভেঙে দেওয়ার মাধ্যম এই মোবাইল। মানবিক সম্পর্ককে ঠুনকো করে তুলছে। সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার একটা খারাপ প্রভাব তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোবাইল আসক্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় খেয়ে নিচ্ছে মোবাইল। শুধু ছাত্র-যুব সমাজ নয়, বহু কাজের মানুষও এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন। শুধু পড়াশোনা নয়, কাজেরও কত ক্ষতি করছে, তা সমীক্ষা করার দরকার নেই— যাঁদের হাতে মোবাইল আছে, তাঁরা সহজেই সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন। এই দানবের সঙ্গে লড়তে গেলে সবার আগে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। একটা প্রশ্ন যদি নিজেদের সামনে রাখি, তাহলে স্পষ্ট একটা উত্তর পাওয়া যাবে, যা অনেককে দিশা দিতে পারে। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কাজের মানুষ, তাঁরা কতক্ষণ ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্অ্যাপ, মেসেঞ্জারে সময় কাটান— প্রশ্নটা নিজেদের করাই যায়। বেশিরভাগ বিখ্যাত মানুষের হয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় বার্তা প্রদান করেন প্রশিক্ষিত কর্মচারী। তাও তাঁরা সেটুকু করেন নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পর। আমরা সাধারণ মানুষেরা এসব গভীরভাবে তলিয়ে না দেখে মেতে থাকি ওসব নিয়েই। যেকোনো দিকে সাফল্য অর্জন সাধনার বিষয়। লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা যে-পথে হাঁটছি, সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যদি পথের পাশে কী আছে, সেদিকে তাকিয়ে হাঁটি, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা চোদ্দো আনা। রমজানও পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবসাদ গ্রাস করে নিয়েছিল তাঁকে। পারিবারিক সহৃদয়তা আর মনোরোগের চিকিৎসায় রমজান নতুন জীবন লাভ করেন বলা যায়। ধীরে ধীরে ফিরে আসেন লড়াইয়ের ময়দানে। জীবন বাঁক নিতে শুরু করে নতুন পথের সন্ধানে। রমজান দেখলেন, তাঁর পুরোনো সহপাঠীদের কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়ে নানা লোন-স্কলারশিপ নিয়ে বাধাহীনভাবে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, ফিজিক্স অনার্স পড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে যা সময় লাগবে, তারচেয়ে অনেক কম সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিঙে চাকরি পাওয়া যাবে। সুতরাং আবার ভাবনায় বদল আনলেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বসার মনস্থির করলেন। রমজানের সিদ্ধান্ত দেখে বন্ধুদের হাসাহাসির শুরু। কোনো কোচিং না নিয়ে, কলকাতায় ডিএমএলটি পড়তে আসা দাদার কাছে অঙ্কটার প্রস্তুতি নিয়ে আর সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে ২০০৭ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিঙে রমজান র‍্যাঙ্ক করলেন ৭৭১২। টেক্সটাইল টেকনোলজি নিয়ে ভর্তি হলেন গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুরে। টেক্সটাইল পড়ার দুটো কারণ ছিল— এক, পড়াশোনা করে বের হলে বসে থাকতে হবে না, বেতন তেমন আহামরি না হলেও কোথাও-না-কোথাও কাজ পাওয়া যাবে। দুই, টেক্সটাইল নিয়ে পড়লে তেমন চাপ নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় না। অবসাদগ্রস্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে এটা বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। ২০১১ সালে পাস করে গুজরাতের একটা কোম্পানিতে চাকরি পেলেন প্রোডাকসান ম্যানেজার হিসেবে। ৯০০০ টাকা বেতন। ১২ ঘণ্টা ডিউটি। ১৫ দিন ডে, ১৫ দিন নাইট। কাজের পরিবেশও ভালো ছিল না। দেড়-দু মাস পর বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে আসার পর দাদা হুমায়ুন কবীর পরামর্শ দিলেন, 'আল-আমীন মিশন ডব্লিউবিসিএস কোচিং দিচ্ছে, সেটা নে।' দাদার তখন বিয়ে হয়েছে। দাদার আত্মীয় মনিরুল ইসলাম মিশনের ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ার। উনি মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। 'আল-আমীন বার্তা'র নির্বাহী সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কোচিং নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দু-মাস কাজ করার বেতন থেকে পড়ে থাকা হাজার আষ্টেক টাকা হাতে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। আল-আমীন মিশনে ডব্লিউবিসিএস কোচিং নেওয়া আবাসিক ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

আছে কলকাতার বারুইপুরে। ক্লাস হয় পার্কসার্কাসে। ভর্তি-ফি, মাসিক বেতনে অনেকটাই ছাড় পেয়েছিলেন। এই সুবিধা পাওয়ার থেকে বড়ো প্রাপ্তি হল পড়াশোনার পরিবেশ পাওয়া, নিজেকে তৈরি করার ক্ষেত্র পাওয়া। আল-আমীন মিশনের আঙিনা থেকে ফিরে আসার আফশোস ছিল। নতুন করে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন সেই উঠোনে। লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত, এবার দরকার দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা। ব্যর্থ মানুষের থেকে শুধু জগৎই মুখ ফিরিয়ে নেয় না, প্রিয় মানুষরাও হাত ছেড়ে দেয়— এ-কথা রমজানদের মতো যাঁরা ধাক্কা খেয়েছেন জীবনে, তাঁরা ভালো জানেন। কেউ কেউ এই ব্যর্থতাকেই করে তোলেন সাফল্যের সিঁড়ি। ২০০৩ থেকে ২০১১— এই আট বছরে জীবন রমজানকে যে-পাঠ দিয়েছিল, তাকে সম্বল করেই রমজান সাময়িকভাবে মুখ ফিরিয়ে নেন জগৎ থেকে। ডুবে যান পড়াশোনায়। চেষ্টা শুরু করেন নিজের একশো শতাংশ দেওয়ার। একশো শতাংশ না তারও বেশি? 'শুধু যখন চোখ বন্ধ করতাম তখন পড়তাম না। বালিশে মাথা রেখে ঘুমানোর আগে পর্যন্তও ভাবতাম পড়া নিয়ে।' এটাকে কি একশো শতাংশের বেশি বলা যায়? রমজান সেই সময়কার পড়াশোনার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'কখনো অনুশোচনা হত না যে, পড়া হল না বা ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না। একটা মানুষ যতটা দিতে পারে ততটাই বা তারও বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' সাফল্য তো এমন প্রচেষ্টার হাতেই ধরা দেয়। 'প্রচেষ্টাটা শুরু করার পিছনে আল-আমীন মিশনেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। পয়সা কম নেওয়াটা বড়ো বিষয় নয়, বড়ো বিষয় হল পড়াশোনা করার পরিবেশ দেওয়া। মাধ্যমিক পাস করার পর এরকম পরিবেশ আমি কোথাও পাইনি। পড়াশোনার উপযোগী ব্যবস্থাপনা আর সতীর্থ সিনিয়র দাদাদের পরামর্শ নতুন দ্বার খুলে দেয় আমার সামনে। আলিফ মাসুম মল্লিক, মাসুদ গায়েন, হাবিবুর রহমান মণ্ডল, আতাউর রহমানরা উৎসাহিত করতেন। প্রথম দিকে এদের দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম যেমন, পরে এরাও আমার পড়াশোনা দেখে আরও বেশি করে পড়তে শুরু করে। একটা পরিবারের মতো হয়ে উঠি আমরা।' 'ডব্লিউবিসিএস কোচিঙে কতজন ছিলেন আপনারা?' 'আবাসিক কোচিং নিতাম ১৭ জন, যতদিন ছিলাম, ওই প্রায় তিন বছরের মতো, সেই সময়ের মধ্যে ১৪ জন চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।'

রমজান আল-আমীনে ভর্তি হন ২০১১-র নভেম্বরে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বসেন ২০১২-র ফেব্রুয়ারিতে। মেইন হয়েছিল জুলাইয়ে। প্রথমবার ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করলেও মেইন পাস করতে পারেননি। এর কারণ পরে ভেবে দেখেছেন, সঠিক সাবজেক্ট কম্বিনেশনের অভাব। যাঁরা ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের অনেকেই জানেন এই সাবজেক্ট কম্বিনেশনের গুরুত্বের কথা। নিজের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ছাড়াও কোন বিষয়ে বেশি নম্বর ওঠার সুযোগ বেশি আছে, সেদিকে খেয়াল রেখে সাবজেক্ট বাছলে সাফল্য আসার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রমজান যেমন প্রথমবার ম্যাথস রাখলেও পরের বার সেটা বদলে অ্যানথ্রোপলজি নেন। পরের বার পরীক্ষা হয় ২০১৩ সালে। এই সময় সিভিল সার্ভিস ছাড়াও স্টাফ সিলেকশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতেও বসতে শুরু করেন। এসএসসির পরীক্ষায় পাস করে ফুড সাব-ইনসপেকটর হওয়ার চাকরি পান ২০১৫ সালে। সরকারি চাকরি, যা বহু ছেলে-মেয়ের কাছেই স্বপ্ন, সেটা লাভ করে প্রথম সাফল্যের স্বাদ পেলেন রমজান। ২০১৫-র ডিসেম্বরে সাব-ইনসপেকটর অব ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই পদে যোগ দিতে বারুইপুরের হস্টেল ছেড়ে বালুরঘাট, তাঁর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রমজান। ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে ২০১৬-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই চাকরি করেন। ইতোমধ্যে ২০১৩ সালে দেওয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল বের হয়। রমজান ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-সি) পাস করেন। আগের চাকরি ছেড়ে ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দেন ২০১৬-র সেপ্টেম্বরে। ২০১৬-তেই আর-একটা সাফল্যের খবর পৌঁছোয় রমজানের কাছে। পিএসসি পরীক্ষাতেও পাস করেছেন। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে যোগ দেওয়ার নিয়োগপত্র পান। কিন্তু তিনি যোগ দেননি। রমজানের জন্য আরও বড়ো সাফল্য অপেক্ষা করছিল। তিনি ২০১৩ সালের পর হওয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও বসেছিলেন। সেটা হয়েছিল ২০১৫ সালে। এই পরীক্ষার ফল বের হল ২০১৬-র সেপ্টেম্বর মাসে। তখন তিনি এলআরও হিসেবে চাকরি করছেন। পরীক্ষার ফল জানাল— রমজান উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-এ)। আগের চেয়ে আরও বড়ো পদমর্যাদার চাকরি। পদ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার।

ভাবনার অভিমুখ বদলে ফেললে একজন মানুষ কোথায় পৌঁছে যেতে পারেন, তা রমজানকে দেখলেই বোঝা যায়। প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ছেলেটা যে এই সাফল্য অর্জন করবে, তা রমজানের আত্মীয়-স্বজন তো বটেই, খোদ রমজানও কি ভেবেছিলেন? সাফল্য লাভের খিদে যদি জেগে ওঠে তাহলে জীবন অভাবনীয় কিছু দিয়ে যায়।

ভাবনার অভিমুখ বদলে ফেললে একজন মানুষ কোথায় পৌঁছে যেতে পারেন, তা রমজানকে দেখলেই বোঝা যায়। প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ছেলেটা যে এই সাফল্য অর্জন করবে, তা রমজানের আত্মীয়-স্বজন তো বটেই, খোদ রমজানও কি ভেবেছিলেন? সাফল্য লাভের খিদে যদি জেগে ওঠে তাহলে জীবন অভাবনীয় কিছু দিয়ে যায়। পার্সোনাল কম্পিউটার বিপ্লবের পথিকৃৎ স্টিভ জোবস একেই বলেছেন, স্টে হাংরি— ভুখা থাকো। সাফল্যলাভের ভুখ। এমন খিদে, যা অন্য কোনো দিকে তাকাতে দেবে না। রমজান কি এতটাই ভুখা ছিলেন? তিনি যখন বলেন, 'ডব্লিউবিসিএসের জন্য পড়ার সময় আইপিএল দেখিনি, কোনো ম্যাচ দেখিনি, টিভিই দেখতাম না। বেড়াতেও যাইনি। সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম দুটো শব্দ— 'ডব্লিউবিসিএসে সাফল্য'— তখন বোঝা যায় খিদের মাত্রা। তিনি আগামী প্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, 'যারা আল-আমীন মিশনে পড়ছ, তারা জেনে রেখো, এ তোমাদের জন্য আশীর্বাদ, দোয়া। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার একটা অস্ত্র। একে কাজে লাগাও। আর যারা পড়াশোনা করছ, সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলি, একটা জায়গায় না পৌঁছে আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকো না। মোবাইল, সোসাল মিডিয়া, ফেসবুক নয়— সমস্ত সময় ও শক্তি বিনিয়োগ করো শিক্ষার ওপর। মনে রেখো, সাময়িক ভালো লাগা হয়ে উঠতে পারে তোমার জীবনের দুঃখের কারণ।'

পাঠক বন্ধুরা, লেখা শেষ করি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার প্রসঙ্গ দিয়ে। কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন বা শুনেছেন, তাঁরা জানেন, গ্রামীণ কিশোরীর বেণীমাধবের বাড়ি যাওয়ার শখ পূরণ হয়নি। 'সেলাই দিদিমণি' হয়ে মেঝের ওপর বিছানা পেতে একতলার ঘরে বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন। টেক্সটাইল পড়া রমজানও কোনো কারখানায় এরকম 'সেলাই দাদা' হয়ে যেতেন হয়তো। কিন্তু তা হয়নি। শেষ পর্যন্ত রমজান ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, নিজেকে তুলে নিয়ে গেছেন অধিকতর যোগ্য জায়গায়। মনে রাখতে হবে, সবাই কিন্তু রমজান নন। আল-আমীনের মতো অবলম্বন সবার জীবনে নাও থাকতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তিকে মূলত একক লড়াই দিয়েই তাঁর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। রমজান আলির জীবন কি সেই লড়াইয়ে কোনো দিশা দিতে পারল? যদি না পারে, তাহলে জানবেন, এ-লেখা আপনার জন্য নয়। ■

প্রতি বছর আল-আমীন মিশনের বহু ছাত্র-ছাত্রী মেধা আর একনিষ্ঠ পাঠগ্রহণের ফলে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ অর্জন করে। শিক্ষান্তে রাজ্য জুড়ে এবং দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়া এমন চিকিৎসকের সংখ্যা আজ অগুনতি, যারা আল-আমীনের প্রাক্তনী। বহু ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেলের স্নাতক স্তর শেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সফল হয়। অনেকে তারও ওপরে। তাদের সবার সাফল্যের পরিচিতি স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। শুধু এ-বছর, অর্থাৎ ২০১৭ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠগ্রহণের সুযোগপ্রাপ্ত প্রাক্তনীদের পরিচিতি এই পাতায়।

মেডিকেলের স্নাতকোত্তরে আল-আমীনের প্রাক্তনীরা

ডা. তাহেরা খাতুন

এমবিবিএস: নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): ইএসআই পিজিআইএমএসআর, জোকা
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, ফিজিয়োলজি ডিপার্টমেন্ট, কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল
পিতা: উমর ফারুক
মাতা: জাকেরা বিবি
কাশিমনগর, মুরারই, বীরভূম

ডা. সেখ এনায়েত আলি

এমবিবিএস: নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (পেডিয়াট্রিক্স): ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: মেডিকেল অফিসার, হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতাল, হুগলি
পিতা: মরহুম সেখ আবদুল জব্বার
মাতা: শোয়েরা বিবি
গড় মান্দারন, গোঘাট, হুগলি

ডা. আবদুল হাই সিদ্দিকী

এমবিবিএস: নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** মেডিকেল অফিসার, ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল
পিতা: মহম্মদ আবদুল হাফিজ
মাতা: লুৎফুন নেশা
কবি নজরুল সরণি, বাবুইপুর, কলকাতা

ডা. আশিক হোসেন

এমবিবিএস: নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (পেডিয়াট্রিক্স): আইপিজিএমই অ্যান্ড আর (পিজি হাসপাতাল)
চাকরি: মেডিকেল অফিসার, রেয়াপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুর
পিতা: আবিদ হোসেন
মাতা: সাবিনা পারভিন
শান্তিপুর, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর

ডা. মহম্মদ আমানুল্লাহ্

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (জেনারেল সার্জারি): বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, কমিউনিটি মেডিসিন, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: মহম্মদ আসাদুল হক
মাতা: মেহেবুবা বিবি
বাটিকামারী, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

ডা. সেখ কামাল হাসান

এমবিবিএস: বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (সাইকিয়াট্রি): আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, কমিউনিটি মেডিসিন, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: আব্দুল কাসেম মণ্ডল
মাতা: নিলুফা বেগম
ঝিদহ, টিটাগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ডা. ঔরঙ্গজেব

এমবিবিএস: ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (জেনারেল মেডিসিন): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: নাহিরুদ্দিন
মাতা: আশিয়া বিবি
সীতানগর, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

ডা. মসিহুর রহমান

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (পেডিয়াট্রিক্স): রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, কমিউনিটি মেডিসিন, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সেখ হায়াতুল্লা
মাতা: ফিরোজা বেগম
শিমুলিয়া, মঙ্গলকোট, বর্ধমান

ডা. মহম্মদ জসিমুদ্দিন খান

এমবিবিএস: নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (পেডিয়াট্রিক্স): আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটল
চাকরি: মেডিকেল অফিসার (এসএনসিইউ), ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল
পিতা: মরহুম আবদুল আজিম খান
মাতা: জনাবা বিবি
নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া

ডা. মফিজুল মণ্ডল

এমবিবিএস: আইপিজিএমই অ্যান্ড আর **এমএস** (ওব্স্ট অ্যান্ড গাইনি): চিত্তরঞ্জন সেবা সদন
চাকরি: মেডিকেল অফিসার (এসএনসিইউ), ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল
পিতা: নুর মহম্মদ মণ্ডল
মাতা: সারিফা বিবি
কর্পূরডাঙা, কালনা, বর্ধমান

ডা. মহম্মদ হাসানুজ্জামান

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (জেনারেল মেডিসিন): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** মেডিকেল অফিসার, বারাসাত জেলা হাসপাতাল, উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিতা: মরহুম মহম্মদ মাহামুদ আলি
মাতা: আকলিমা বিবি
মঞ্জিলহাটি, দেগঙ্গা, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ডা. আনতাজ আলি

এমবিবিএস: বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (ওব্স্ট অ্যান্ড গাইনি): বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: মেডিকেল অফিসার, রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল, বীরভূম
পিতা: মরহুম সেখ নওসের আলি
মাতা: হাজিরা খাতুন
বদুরচক, জাঙ্গিপাড়া, হুগলি

ডা. মহম্মদ সামিম সম্রাট

এমবিবিএস: নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (চেস্ট মেডিসিন): ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: মেডিকেল অফিসার, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রতুয়া, মালদা
পিতা: মহম্মদ আবদুল মাতিন
মাতা: আঙ্গুরি বেগম
আড়াইডাঙা, পুখুরিয়া, মালদা

ডা. মহম্মদ জামানুর রহমান

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (রেডিয়ো ডায়াগ্নসিস): বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
চাকরি: ডেমনস্ট্রেটর, বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: মহম্মদ ফজলুর রহমান
মাতা: মর্জিনা বেগম
সন্তোষপুর, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা

ডা. সেখ ইয়াসিন মণ্ডল

এমবিবিএস: আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (ট্রপিক্যাল মেডিসিন): ইনসটিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন
চাকরি: পুরুলিয়া রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল
পিতা: সেখ আবু তাহের মণ্ডল
মাতা: আজমিরা মণ্ডল
হামিদপুর, হাঁড়াল, দাদপুর, হুগলি

ডা. মতিউর হক

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** ব্লক মেডিকেল অফিসার, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
পিতা: সেখ আইনুর হক
মাতা: ইসমোতারা বিবি
মহেসাইল, সুতি, মুর্শিদাবাদ

ডা. মহম্মদ কামাল হাসান

এমবিবিএস: আইপিজিএমই অ্যান্ড আর **এমএস** (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান
চাকরি: মেডিকেল অফিসার (এসএনসিইউ), মালদা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: মহম্মদ আব্দুল মালেক
মাতা: রওশনারা খাতুন
ধামুলি, পুখুরিয়া, মালদা

ডা. সাহিদ হোসেন

এমবিবিএস: নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটল **এমডি** (রেডিয়ো ডায়াগ্‌নসিস): বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** ডেমনস্ট্রেটর, অ্যানাটমি, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সাহাদাত হোসেন
মাতা: মনোয়ারা বেগম
ডাঙ্গাপাড়া, হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর

ডা. মহম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন

এমবিবিএস: বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (জেনারেল মেডিসিন): ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** মেডিকেল অফিসার (এসএনসিইউ), ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল
পিতা: আব্দুল হাফিজ
মাতা: কুলসুম বিবি
কারবালা রোড, রাজাবাগান, কলকাতা

ডা. আবদুল মুকিত আনসারি

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (অপথ্যালমলজি): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** মেডিকেল অফিসার, মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতাল
পিতা: মহম্মদ মহিদ আলি
মাতা: মাজিদা বেগম
মরিচা, ভাঙড়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ডা. মহম্মদ সামিম রেজা

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমডি** (ডারমাটোলজি): বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **চাকরি:** মেডিকেল অফিসার, আড়াইডাঙা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রতুয়া ২, মালদা
পিতা: মহম্মদ মাসুদ দুলাল
মাতা: সামিরা ইয়াসমিন
বৈকুণ্ঠপুর, রতুয়া, মালদা

ডা. সালমা খাতুন

এমবিবিএস: নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল **এমএস** (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: মহম্মদ আজগার আলি সরদার
মাতা: হাসিনা বিবি
৪ নং স্যান্ডেলের বিল, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ডা. রেশমা পারভিন

এমবিবিএস: কেপিসি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমএস (ওব্‌স্ট অ্যান্ড গাইনি): নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: রাফিউদ্দিন আহমেদ
মাতা: জাহিদা বেগম
হাটপুকুর, চণ্ডীতলা, হুগলি

ডা. কবীর হোসেন

এমবিবিএস: আইপিজিএমই অ্যান্ড আর **এমডি** (অ্যানাস্থেসিয়া): আইপিজিএমই অ্যান্ড আর
পিতা: আবুল কালাম আজাদ
মাতা: মাহাফুজা খাতুন
চাতরা, মুরারই, বীরভূম

ডা. কলিমুদ্দিন খান

এমবিবিএস: মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (পেডিয়াট্রিক্স): চিত্তরঞ্জন সেবা সদন
পিতা: মহম্মদ নুরুদ্দিন আহমেদ খান
মাতা: জাইবুন্নেশা বিবি
মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ, কলকাতা

ডা. নাজমু সাহাদাত মল্লিক

এমবিবিএস: নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (জেনারেল মেডিসিন): বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: কাজেম আলি মল্লিক
মাতা: রাসিদা খাতুন
রাজাপুর, বেড়ামারা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ডা. সেখ রফিজুদ্দিন আহ্‌মেদ

এমবিবিএস: ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (জেনারেল মেডিসিন): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সেখ এসাবুদ্দিন আহ্‌মেদ
মাতা: বাবিনা খাতুন
আড়াইডাঙা, রতুয়া, মালদা

ডা. চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম

এমবিবিএস: আইপিজিএমই অ্যান্ড আর
এমএস (জেনারেল সার্জারি): আইপিজিএমই অ্যান্ড আর
পিতা: চৌধুরী আব্দুল মান্নান
মাতা: চৌধুরী ফিরোজা বেগম
বড়শা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান

ডা. হাবিবুর রহমান

এমবিবিএস: নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (জেনারেল মেডিসিন): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: নুর হোসেন
মাতা: কোহেনুর বিবি
পোড়বোনা নাজিরচক, রানিতলা, মুর্শিদাবাদ

ডা. সেখ ওয়াসিম রাজা

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (রেডিয়ো ডায়াগ্‌নসিস): বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: গোলাম কুদ্দুস সেখ
মাতা: নুরনেহার বিবি
কুলে, মন্তেশ্বর, বর্ধমান

ডা. সেখ মইনুদ্দিন

এমবিবিএস: আইপিজিএমই অ্যান্ড আর
এমএস (অর্থোপেডিক্স): বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সেখ তাহিরুদ্দিন
মাতা: কোহিনুর বেগম
তাতারচক, আরামবাগ, হুগলি

ডা. সেখ শাহ্‌রিয়ার আহ্‌মেদ

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (ডারমাটোলজি): বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সেখ কামাল আহ্‌মেদ
মাতা: সামসেরা বেগম
পারুলিয়া, দেগঙ্গা, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ডা. সেখ জামির হোসেন

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (জেনারেল মেডিসিন): ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: সেখ আব্দুল রউফ
মাতা: কারিমা বেগম সেখ
পুরপাট, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

ডা. সেখ সামিম রহমান

এমবিবিএস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
এমডি (প্যাথলজি): নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
পিতা: মরহুম সেখ জামাল উদ্দিন
মাতা: মাসুদা বিবি
দর্জিপোতা, আরামবাগ, হুগলি

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। শুরু হল বঙ্গাদর্শন।

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

অশোককুমার কুণ্ডু

সময়টা মাঘের শেষ। শীত যাই করেও মায়া বাড়ায় পোষা বেড়ালের মতন। পায়ে পায়ে জড়ায়। চলেছি আমাদের একমাত্র আত্মজার সঙ্গে দেখা করতে। তা কতদিন পরে? হ্যাঁ, বিশ সাল বাদ। কত্ত বছর পরে দেখা হবে! গাঁ-ঘরে পিতার বড়ো আদরের ধন এই কন্যাসন্তান। কথায় বলে না, কন্যা হল গিয়ে লক্ষ্মী। ছড়া আছে, 'প্রথম কন্যা যার/বহু ভাগ্য তার'। গ্রামীক জীবনের চালচিত্রের এই মরমি বার্তাটুকু পৌঁছোল না আমাদের শ্রদ্ধেয়া নারীবাদীদের, প্রগতিপন্থীদের হৃদয়মহলে। কত কত আবাদ যে পুড়ে ছাই হল ...।

খুউবই সন্তর্পণে পা ফেলেছি। হুট করে কি দেখা করা যায়! মন চাইলেই কি আর পা সরে? অথচ, বিশ সাল পহেলে কত কত স্বপ্ন-গাথা ছিল সন্তান নিয়ে। এত বছরের ব্যবধানে সেও তো পরিণত, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝপথে। চমকে যাবে। চমকে দেব। পরস্পর মুখোমুখি। কিন্তু এত বছর, দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য আত্মজা পিতার দিকে তাকিয়ে, অভিমানে যদি ঝরে পড়ে? কেমন করে সে নেবে তার বাবার এই সশরীরে উপস্থিতি। ভয়ে, সংকোচে আমি মরো-মরো। এই শেষশীতে কুলকুল ঘামছে আমার শরীর। কল্যাণী সীমান্ত লোকাল ট্রেনের পথটি অচেনা নয়। কতবার তো এ-পথে এসেছি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'মাটির মানুষে'র খোঁজে, অথবা সতীমায়ের মেলায়। তবুও এত সংশয়-সংকোচ কেন তোমার? এত অপরাধবোধ ক্রিয়া করছে কেন?

অনুমতি নিয়েই তো যাচ্ছি দেখা করতে। আত্মজার মায়ের অনুমতিও নেওয়া হয়েছে। আসলে সময় বড়ো নিষ্ঠুর। সে যা নেয়, তার পল-অনুপলও ফেরত দেয় না। কণামাত্র কৃপা করে না। শত বর্ষার জলধারে সে আসে না ফিরে। আর কখনো না। এই হারানো কুড়িটি বছরের একটি খণ্ড দিনও ফিরে আসবে না। আসিবে না কোনোদিন।

বিগশপারে ভরেছি সদ্য কালকের কেনা সমাজতত্ত্বের বই। তাতে নানা রঙের কলম ও পেনসিল। জানি, শৈশব-কৈশোর পার হয়েছে সে। তবুও সময় যেন থমকে আছে বিগশপারে। অত বই তো আর পারসেলে পাঠানো যায় না। বড্ড খরচ। নিজেই গিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে বই উপহার দেব। এসবের মধ্যে একটা গুহ্য তত্ত্ব আছে বই কী। তা কী? মনের আর-একটা মন, মুচকি হেসে বলে, বিটিকে দেখতে চাও তো? টেলিফোনে কণ্ঠ শুনেছ। এ-বার কণ্ঠের সঙ্গে শ্রীমুখ দর্শন।

তা তো সত্যি। দেখনি গ্রামদেশে, বাবা কতবার দূর গ্রামে বিবাহিতা কন্যাকে দেখতে যায় আলুর ফলন ভালো হলে, আলু নে যায়। গৃহপালিত হাঁসের আন্ডা নিয়ে যায়। এসবই অদ্ভুত মায়ার চালচিত্র। ফেলা যায় না। ফেলে আবার কুড়িয়ে নেয়। মৌসুমী ভৌমিক গেয়ে ওঠেন, 'কিছুই ফেলতে পারি না ...'। রাঢ় বাংলার সীমান্তে, দীপাবলির পরবের সময় গরিব বাবা, সামান্য সামগ্রী নিয়ে আসেন কন্যার শ্বশুরালয়ে। চটের থলেতে এই একটু চালভাজা, একটু সবজি, হয়তো বাড়ির পোষা একটি হাঁস। বিস্ময়ের সীমা নেই। থলের ভিতরে থাকে ছোটো ছোটো রঙিন মাটির ঢেলা। এই রঙিন মাটি মেলে পশ্চিমবাংলার সীমা শেষে, বিরামড়ি স্টেশনের ডানদিকে মাল্‌তি টিলায়। গ্রামের অনেক মেয়ের নাম মাল্‌তি, ওরফে মালতি। দীপাবলির পরব। বাপের বাড়ি থেকে কিছু না এলে, অভিমান শিশিরবিন্দু হয়ে ঝরে। ওই রঙিন মাটির গোলা দিয়ে মাটির দেয়াল রং করে। ছবি আঁকা হয়। নারীই তো চিত্রার্পিত করে সংসারের চালচিত্র, নিত্যদিনের গ্লানি মুছে।

চিন্তার ক্লান্তিতে আটসকালে ঢুলুনি এল। কল্যাণী-ঘোষপাড়া এলে, সহযাত্রী ঠেলা দিয়ে উপকার করলেন। নেমেই দেখতে পাচ্ছি ফুলে ফুলে ছয়লাপ। শুদ্ধ মনের সফেদ রং, সাদা ফুলের রং এবং ফুলের বন্যা। এ-ফুল, পথের কবি বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। এ-ফুল এখনও হাইব্রিড নয়। সামাজিক সম্মানও নেই তার। তবে লোকায়ত চালচিত্রে ঘেঁটু ফুল দিয়ে মজার মজার সব ছড়া আছে। 'ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় বোসেদের বাড়ি/ চাল-ডাল না-দিলে সমবচ্ছর আড়ি'। এমন মাধুকরী করে শিশু-কিশোররা। বিকেল-সন্ধ্যায় তাই রেঁধে ভোজ।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা গেট পার হয়ে বড়ো মাঠ। মাঠেই কত কত লিচু গাছ। তাতে ডাঁসা-কাঁচা লিচু। বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্বীরা লাঠি-সোঁটা দিয়ে, একজনের পিঠে চড়ে অন্যজনা লিচু পাড়ছে। লিচু উপলক্ষ। বাদবাকি সব হইচই, খেলা। করুক গে। পড়ে হাত পা না

ভাঙলেই হল। ওদেরই ভিতরে কি কেউ একজন আমাদের আত্মজা রিখিয়া। বিষ্ণু দে মহাশয়ের 'রিখিয়ার ডায়েরি' থেকে নামটি নেওয়া। আদিবাসী ভাষায় রিখিয়া শব্দার্থ ছোটো টিলা। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বিষ্ণু দে-সহ অনেকে, শান্তির বসত গড়তে চেয়েছিলেন।

মেয়েদের হস্টেলে ঢোকার আমি তো অনুমতি পাব না। তাই ফোনে আত্মজা বলেছিল, 'আপনি আসুন। আমি ঠিক চিনে নেব।' মেইন গেটের পাশে সিকিউরিটিদের বসার জায়গা। যতই গেটের কাছে যাই, পায়ে পায়ে মৃদু ভূকম্পন। প্রথম বাক্য তাকে কী বলব? যদি রিখিয়া বলে ওঠে, 'এত দিন পরে এলেন?' আমি কি উত্তর খুঁজব? আমার দূরভাষের কণ্ঠস্বর সে হয়তো মনে রেখেছে। এসব মেয়েরা বেশ মনে রাখে। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত বিগশপার নিয়ে, গেটের কাছে সিকিউরিটিকে, 'ভাই আমি রিখিয়ার বাবা। একটু দেখা ... '

বেরিয়ে এল খোলা চুলে, জিন্‌স পরিহিতা, হাতে বই আর সিলেবাস নিয়ে, 'এই তো আমি রিখিয়া। আপনি তো সাতটা বাহান্নর কল্যাণী সীমান্তে...' আমাকে চকোবার দিয়ে প্রথম দেখার উপহার। একটু দমেছি, জিন্‌স আর টপ এবং খোলা চুল দেখে। এরা বিনোদবেণী জানে কি? জানে কি শরীর ঢাকার, আব্রু-আমন্ত্রণের শাড়ি। যাক গে। যে সময়কার যা। সাত-পাঁচ ভেবে মনখারাপ করে কী হবে! এই রিখিয়া, নব্য প্রজন্মের সমাজবিদ্যার ছাত্রীকে আম-গ্রামের ভ্রমণবার্তা পাঠাব। নিশ্চিত জানি, মানুষ অখণ্ড-বিপুল সম্ভাবনায় বাঁচে। নিশ্চিত সে আমার গ্রামবাংলার পাঠ হেলা ভরে ফেলে দেবে না। পাঠ নেবে আনন্দে।

শুভযাত্রা শুভকাল

যাব, এই তো কাছেই। আমার তো দৌড়, মোল্লার দৌড় মসজিদতক। যত দূরেই যাই-না-কেন, নিকটই মনে হয়। তা ছাড়া বহু দূর দেশে ভ্রমণে আছে কতিপয় সমস্যা। এক, বিপুল পাথেয়। রাহাখরচ। ট্রেন, হাওয়াই জাহাজের বুকিং। সেখানে, গন্তব্যে নিরাপদ আশ্রয়। ফেরার কনফার্মড টিকিট। অতশত সাত-সতেরো ঝামেলায় গিয়ে, ভ্রমণ-বিভ্রমণে দরকার নেই। দেখি না কেন, ঘরের কাছে একটি শিশিরবিন্দু। সেই বিন্দুতে কি দেখা দেবে না বিশ্বপট? সাধক হলে জায়নামাজেই দেখা পাবে, পরশ পাবে কাবার সুগন্ধ— আমার মোমিনা বুবু বলতেন। সাকিন, গ্রাম উত্তর বলরামপুর। পোস্ট মিরগা-চাতরা। জিলা হুগলি। ভায়া আরামবাগ। পিন কোড জানি না।

মোমিনা বুবুর আব্বাজান মৌলভি, সেখ আবদুল রহিম বড়ো কড়া। লোকায়তের ভূষণে বড়োই মরমি। উনি জোহরের নামাজ সেরে, দুপুরের খাবার সেরে বিশ্রামে। আমরা দঙ্গল বেঁধে দো-তলায় রেডিয়ো কাঁথা চাপা দিয়েছি, গ্রীষ্মের দুপুরে। রেডিয়োর কি শীত করছে? জ্বর? ও মলো যা। তাও জান না? অনুরোধের আসর কি ছাড়া যায়! রিয়াজুল-বেনো-আমি-মোমিনা-সোমিনা কাঁথাচাপা রেডিয়োর ক্ষীণ কণ্ঠে কৈশোর থেকে যৌবন ছুঁতে চলেছি।

আমার মলিনা মা বলতেন, সব আলোই শুদ্ধ। সন্ধ্যোবাতির আলো যেমন, তেমনি শবেবরাতের আলো। আলোর কোনো জাত নেই। মনেরই দোষ। সে জন্ম দেয় অন্ধকারকে। নিভিয়ে দেয় আলো। তোমার 'খোয়াইবুড়ো তো সেই কবেই লিখে গেছেন, গেয়েছেন, যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে ...। খোকা ভুলিস না এ দেশের গ্রাম-জীবনকে। তাকে হিয়ায় ধরিস। অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে, একটি প্রদীপ নীরবে জ্বালানো ঢের ভাল। ঢের মঙ্গলময়।'

অতশত সাত-সতেরো ঝামেলায় গিয়ে, ভ্রমণ-বিভ্রমণে দরকার নেই। দেখি না কেন, ঘরের কাছে একটি শিশিরবিন্দু। সেই বিন্দুতে কি দেখা দেবে না বিশ্বপট? সাধক হলে জায়নামাজেই দেখা পাবে, পরশ পাবে কাবার সুগন্ধ— আমার মোমিনা বুবু বলতেন।

না, মলিনা মা। আমি ভুলিনি তোমাকে। তোমার গ্রামজীবনকে। তাই তো চলেছি দক্ষিণবঙ্গের ছোট্ট একটি স্নানমেলায়। ফেরার নয়, ট্রেডও নয়, নয় কালচারাল এক্সচেঞ্জ। বিনিময়ও নয়। আমি গ্রাহক মাত্র। অসম্পূর্ণ আমি। পূর্ণ হব বলেই তো এই পুণ্যমাত্রা। ছিয়াত্তুরে ধরা বিখ্যাত ডাক্তার, ততোধিক বিখ্যাত ল্যান্ডস্কেপ ফোটোগ্রাফার ডা. বিবেকসাধন পাল বলেন, 'যদি না পড়ে পো (পোলা)/ তারে নিয়ে সভায় থো।' লেখাপড়ায় মন নেই তো পোলাকে পাঁচজন মুরুব্বি, আমজনতার সভায় রেখে এসো। জীবনের পাঠ সে জেনে নেবে। শিখে যাবে।

তোমরা তো আবার সাদা চামড়ার সাহেবের কথা না হলে মান্য দাও না রিখিয়া। তবে শোনো। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের এক ম্যানেজমেন্ট গুরু একটি গ্রন্থ নির্মাণ করেছিলেন, 'হোয়াট দে ডিডিন্ট টিচ ইউ ইন দ্য ইউনিভারসিটি অব হারভার্ড'। এই সভামণ্ডলীর কাছে, বুধমণ্ডলীর কাছে, গ্রন্থ ছাড়া জ্ঞানমার্গীদের কাছে, জ্ঞানের গ্রন্থি মোচন। নলেজ বনাম উইজডম। লেখাপড়ায় ব্যর্থ আমি, তাই চলেছি গ্রামীণ জনপদে, ফোক উইজডমের পদতলে।

বুড়ো হতে আর কি বাকি? বাহাত্তুরে ধরব ধরব। ট্রেনে ডিসএবেল, থুড়ি, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জিদের সিট পাক্কা। কিন্তু ট্রেনে ষাটোর্ধ্বদের, মানে, কিতাবি আখ্যায় সিনিয়র সিটিজেন ওরফে সুন্দর শব্দবন্ধ, 'প্রবীণ নাগরিকে'র বসে যাওয়ার সুযোগ দেখতে পাইনি। 'দাদু উঠুন, এবার আমাকে চান্স দিন। বারুইপুর কখন পেরিয়ে গেল।' দক্ষিণবঙ্গের এই ট্রেনের অলিখিত সৌহার্দ্য-শর্ত, বারুইপুরের পরে বসা-যাত্রী সিট ছেড়ে দেবে সামনে দাঁড়ানো যাত্রীকে। আর ভিড়! ভিড় তো হবেই। গ্রামীণ জনপদ ভোর থেকে উঠে আসে। নগরমুখী হয় নিত্যদিন। খুউব সকালের ট্রেনের নাম 'ঠিকে (ঝি) স্পেশাল'। আর কোলাহল! মনে হবে বিশ্বসংসার একযোগে অখণ্ড জমায়েতে চিল্লাচ্ছে। সবই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। শান্তি কোথায় মোর তরে হায়! নীরবতার চাষ কি কবরে, স্মৃতি-স্মারকের নীচেই থাকে? উঠে আসে না কেন মাঝেমধ্যে উপরিতলে?

কামরায় ভিড়ের বহর? মুখোমুখি সিটে তিন-তিন ছ-জনের বদলে চার-চার আট জন। মাঝের ফাঁকা 'ময়দানে' চার-চার আট জনে দাঁড়িয়ে। ওরই মধ্যে প্রবাসী-উদাসী হাওয়া নাস্তা হয়ে, হঠাৎ বয়ে চলে। গরমে নাস্তানাবুদ যাত্রীদের কিঞ্চিৎ আরাম দেয় মুফতে। দাঁড়ালাম সিট ছেড়ে। যুবকটি মনের আরামে জানলার ধারে দামি মোবাইলে নেট, এফবি চ্যাট করতে বসে গেলেন। কী কল বানাইয়াছ

বৈরাগী/ মুঠি-ফোনে আমি সাত-সোহাগী। মানুষকে এতটা বিচ্ছিন্ন করে দিল ওই ছোট্ট যন্ত্রটি। হায় খোদা। হায় শিবশম্ভু। সমস্ত আবিষ্কারের পরেও যে চাই, একটি সচল অঞ্জুলি। যে মেশিনকে প্রাণ দেবে। প্রাণের থেকেও কি বড়ো ভারচুয়াল প্রাণ। খোদায় মালুম।

মানুষ দেখতে ভুলে যাবে, ভুলে যাবে প্রতিবেশী-পড়শির মুখ। অংশ নেবে না, মেশাবে না আপন-পরের দুখ-সুখ-সঙ্গ। দেখবে না জানলার পাশে ছুটন্ত, এই ফাগুন-চৈত্রে ফলন্ত আম-লিচু-সবেদা-পেয়ারা গাছ। বারুইপুরের খ্যাতি তো ফল-ফলারিতে? দেখবে না আবাদভূমি? যা তোমাকে, রিখিয়া, তোমাকেই বলি, নিত্যদিন খাদ্যের জোগান দেয় এই আবাদ। এফবি, নেট, স্যাট তুমি বাবা দিগ্‌গজ হয়ে মানুষকে এতটা নির্বোদ করে তুলেছ। সমাজ-সংসার-মায়া-মমতা ত্যাগ করে শুধু বটমে খুটুর খুট।

শেয়ালদা থেকে নামখানার ৩ টা ১৫-র ট্রেন ছুটছে। যাব মথুরাপুর রোড স্টেশন। যাত্রীরা বলে থাকে মথুরাপুর। ওই হল, একই কথা। ওখান থেকে ম্যাটাডোর/অটো/ টোটো করে গ্রাম, উত্তর কাশীনগর। গন্তব্য 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল'। কাশীনগর বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্রের গড়া যাত্রী প্রতিক্ষালয়ের শেড। অটো থেকে নেমে টুকু পথ। চক্রবেড়িয়ার মহাশ্মশান। আদি গঙ্গার মৃত স্রোতে পড়ে আছে মজা স্মৃতির স্তব্ধ জলাশয়। পুকুর বলে না কেউ। বলে গঙ্গা। ওরই জলে পড়শি গাঁয়ের হাজার মানুষের স্নান। চৈত্র মাসের অমাবস্যায় পুণ্যস্নান এবং প্রয়াত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল-দান, তিল-তর্পণ। এই চৈত্র মাসেই হয় আমবারুণীর স্নান। গাছের আম বৃন্ত-সহ পুণ্যদিঘিতে দান করে, গলা জলে ডুব। লোকব্রতে মানুষ ছুতোনাতায় দিঘি-নদীতে ডুব দেয়। গাছের প্রথম ফল দেয় জলে।

আমার মলিনা মাও দিত। কমলি গাভীর প্রথম বাচ্চা হলে তার দুধ, নবান্নে ওঠা প্রথম ধান্যের বানানো পরমান্ন, খোড়ো চালের ঝুলন্ত লাউ অথবা ভাদুরে কুমড়ো। মা নিজ হাতে বাড়ির কাছে জাগ্রত পিরের থানে, ডালা সাজিয়ে একমাথা ঘোমটা টেনে অপেক্ষা করত। আমি ডেকে আনতাম পড়শি আলম সাহেবের ভাই, আজানিয়া রোবো সেখ, ওরফে রবিওল সেখকে। তিনি দোয়া দরুদ পড়ে, উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে কাকে ডাকতেন। খুউব সুরেলা আজান দিতেন ভোর-ফজরে, ভোরাই আজান। মনে আছে মা, ভুলিনি।

সেই ডাকে ঘুম ভেঙে পরীক্ষার পড়ায় বসতাম। তখন তুলসীতলায় মলিনা, তোমার শঙ্খধ্বনি মাহেন্দ্রক্ষণকেও জাগাত। প্রদীপের শিখা দুলত বাতাসে। কীর্তনীয়া হরিকাকা কার্তিকের হিম ভেঙে গেয়ে চলত, 'রাঈ জাগো রাই জাগো'র সঙ্গে মৃত্তিকা-মৃদঙ্গ হাঁটত। আজানিয়ার বিকেলের চা বাঁধা আমাদের বাড়িতে। দারিদ্র্যপীড়িত এই মেহমান বড়োই মহাজন। ওঁকে কখনো ফাটা কাপে ভুলেও চা দিত না মলিনা। তবে আমার বড়দা একটা ছড়া রচেছিল, 'আলম সাহেব লোকটি ভালো/ঝগড়া করে কম/তার ভাই রোবো সেখ মাছ ধরার যম।'

বড়ো, ভারি টাইফয়েড থেকে ওঠার পরে, প্রথম পথ্য, গলা ভাতের সঙ্গে জিয়োল মাছের পাতলা ঝোল, জিরে সহযোগে। ওই জিয়োল মাছ, মাস ভর রোবো সেখ নিজে দিয়ে যেতেন। মলিনা দাম দিতে চাইলে বলতেন, 'গোনা (গুনাহ্) হবে মা।' মা অবিশ্যি ছুতোনাতায় আমার হাত দিয়ে এটা-সেটা পাঠাত ওদের সংসারে।

মা নেই আজ। আলম সাহেব, রোবো সেখ কবরে। মানুষ কি আশমানের সপ্তাকাশে, বিভূতিভূষণের দেবযানে, এই ধরণীর কোণে বেঁচে থাকে সজীব-স্মৃতি-পরম্পরায়? বড়ো সাধ জাগে মনে, তোমাদের দেখি ক্ষণে ক্ষণে। কিছুই হারায় না। কোনোকিছুই শোধবোধ হয় না। সুদ-আসল-চক্রবৃদ্ধি সবই পড়ে থাকে মহাজনের খাতায়। এই-ই চলমান জীবন।

আপনারা যারা এই চলন্ত ট্রেনে চলেছেন, তারা দেখুন। আমি আজকেরে আপনাদের সামনে এনেছি হিমালয় গোটাটা। খাবেন। চুষবেন। জান ঠান্ডা। প্রাণ ঠান্ডা। একটা আইসক্রিম দু-টাকা। এক্কেরে এয়ার কন্ডিশন। দেখবেন, একটা খাওয়ার পরেই, বাড়িতে ফিরে বিবির সঙ্গে ঝগড়া হবে না। চলে

যাবার আগে হাত বাড়িয়ে, ডাক দিয়ে চেয়ে নেবেন। দাম মাত্র এক পিস হিমালয় গোটাটা, দু-টাকা। না খেলে পাবেন না। খেলে আবার খাবেন।

কাউকে ব্যথা দেবেন না। নিজেও ব্যথা পাবেন না। তবে মনের ব্যথা সারানোর মুরোদ আমার নেই। কিন্তু আমার ব্যথার তেল বিষহরি, এক্কেরে শরীরের ব্যথার যম। কানে ব্যথা, ও দাদা দাঁতে ব্যথা, ও দিদি বাতের ব্যথা— সব সারায় আমার এই বিষহরির তেল। ও দাদা, অনেক ডাক্তার বদ্যি তো হল। হাজার হাজার টেস্টও হয়েছে। কিন্তু ঘুম থেকে সকালে উঠেই বাপ রে মা রে করেন। বসলে দাঁড়াতে পারেন না। দাঁড়ালে বসতে পারেন না। খুউবই যন্ত্রণার জীবন। একটা ছোটো ফাইল ব্যবহার করে দেখুন না। বিষহরির দয়ায় সেরে যাবে। যাচ্ছি দাদা। বড়ো ফাইল? আজ শেষ হয়ে গেছে। আজ মাঝারিটা নিন। আপনি তো মল্লিকপুরে নামবেন।

বিষহরি ছোটো ফাইল পনেরো। মেজো পঁচিশ। বড়ো চল্লিশ। আমার কাছে লুজ কৌটো থেকে কয়েক ফোঁটা নিন। দাম লাগবে না। হাতে নিন, কানে দিন। হাতে নিন, গালে দিন। হাতে নিন, গাঁটে গাঁটে ব্যথা যেখানে, সেখানে মালিশ করুন। অব্যর্থ বিষহরি। প্রয়োগে ব্যর্থ হলে কান বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার। মুলে দিন। গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার। চড় মারবেন। আপনি চড় মারতেই পারবেন না। কারণ, এই তেল অব্যর্থ। আমার ভুল হবে না। কারণ, বিষহরি মিথ্যা বলে না। তবে গণ্য-মান্য শিক্ষিত দাদা-দিদি, মা-বোনেদের বলে রাখি, বিষহরি মনের যন্ত্রণা দূর করতে পারে না। আমার বলা শেষ। পরের স্টেশনেই নেমে যাব আমি। আপনাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

বিস্ময়কর কথ্যভাষ্যের সেলসম্যানশিপ। অন্তরনির্মিত বিক্রেতার ভাষ্য। আটারলি বাটারলি বেঙ্গল হকার। বেঁচে থাকো চিরজীবী হয়ে। বিজ্ঞাপনের কপি এডিটররা শুনলে, দেখলে অবাক হতেন। সত্যিই আনপুটডাউনেবল। প্রতিটি প্রোডাক্টের ভাষা, বিন্যাস, ভয়েস— এককথায় অপূর্ব। তবে দক্ষিণবঙ্গের 'ফটাস' জলের বিজ্ঞাপন ওই বোতলের শব্দেই— ফটাস। ভয়ে ভয়ে পান করে দেখেছি, মন্দ না। কত কত পরিবার, কত মানুষ বেঁচে আছে এই জীবিকায়। কী পরিশ্রম! চলন্ত, ভরন্ত ট্রেনে ঠিক বোঝা নিয়ে মাছি না-গলা ফাঁকে, ট্রেনের ল্যাজা-মুড়ো। রিখিয়া, তুমি সমাজতত্ত্বের গবেষণার পাঠ নিতে পারো, আমি তবে তোমার সঙ্গী হব।

এই হকাররা তো বিশ্ববিদ্যালয় মাড়ায়নি। হয়তো অনেকেই স্কুল-ড্রপ।

> তখন তুলসীতলায় মলিনা, তোমার শঙ্খধ্বনি মাহেন্দ্রক্ষণকেও জাগাত। প্রদীপের শিখা দুলত বাতাসে। কীর্তনীয়া হরিকাকা কার্তিকের হিম ভেঙে গেয়ে চলত, 'রাঈ জাগো রাই জাগো'র সঙ্গে মৃত্তিকা-মৃদঙ্গ হাঁটত। আজানিয়ার বিকেলের চা বাঁধা আমাদের বাড়িতে।

হয়তো মাথা ভালো ছিল। সংসারের দাবিতে পথে নেমেছে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর ডালি হাতে দিয়ে এদের গৃহলক্ষ্মী, মা-বোন-স্ত্রীরা পাঠিয়ে দিয়েছে চলন্ত লোকালে। এরা ঘরে ফেরে রাত্রি ন-টা ছাপান্নর লোকালে। এই লড়াইয়ের জীবন আমার কাছে শুদ্ধ এক বিস্তার। এদের ঘর্মাক্ত জীবনের কথা আধুনিক, উত্তর আধুনিক লেখকরা কোনোদিন ছুঁয়েও দেখবে না। কবিতার অধিকাংশ বিষয় হল, তুমি-আমি এবং আমি-তুমি, গদ্যের বিষয় বৈধ-অবৈধ শরীর শরীর। শরীর সমাপ্তি। মন তোমার শরীর নাই।

মনে পড়ছে নরেন মিত্র মহাশয় বয়স্ক, বার্ধক্য-ছোঁয়া এক হকারের হেরে যাওয়ার কথা লিখেছিলেন, সম্ভবত। এ-যুগের অতি খ্যাত কবি জয় গোস্বামীর একটি কবিতা, এই হকার, ট্রেনের চাল বওয়া নারীদের নিয়ে, শেষাংশ— 'চাল তোলো গো মাসি পিসি/লালগোলা বনগাঁয়।' আমি কখনো লিখতে পারব, এদের নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি কথকতা? মনের অসমাপ্ত বাসনা কবরে ঘুমায়। সর্বগ্রাসী অগ্নি তাকে গ্রাস করে। অবোধ বাতাস জঞ্জাল ভেবে সব উড়িয়ে নে যায়, স্মৃতির খোসার ওপর নব্য স্মৃতি নৃত্য করে। রিখিয়া, রিখি, খিয়া, রিয়া এসবই লেখা তোমাদের, নব্য নায়ক নায়িকাদের উদ্দেশে। 'এ-বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা'।

গুগুল জেঠার কাছে এই চলমান জীবনের ছবি পাবে কি না, আমার অজানা। রিখিয়া, মামণি, তুমি কি 'লাইক' করবে এসব গেঁয়ো-গল্প? আমার 'বুদ্ধিমান' বাক্সের টিআরপি নেই। আমি বসন্তের অরণ্যের ভিতর দিয়ে বাতাস-আশ্রয়ী, ঝরা পাতা গো, আমি তোমাদেরই দলে। একা আমি হেঁটে যাই বসন্তের পোস্টম্যান, বর্ণনা দেব এক গ্রামীক মেলার। সেই চালচিত্রে, পাঠক-পাঠিকা তুমি আমন্ত্রিত। গ্রহণ করো বিদূরের খুদকুঁড়ো।

মেলায় হারিয়ে গেছে ছোটো একটি মেয়ে। নাম বলছে রিখিয়া। গ্রামের নাম বলছে ময়নামতী। পরনে বেগুনি লেগিন্স। কাঁদছে। আর কিছু বলতে পারছে না। অভিভাবক কেউ মেলায় থাকলে তৎপর চলে আসুন মেলা কমিটির ক্লাবঘরে।

তার মানে, মেলা জমে গেছে। মেলায় মেলা ভিড়। আমি ভিড় ভালোবাসি আর ভালোবাসি সংকটের মুখোমুখি হতে। এগিয়ে যাই ক্লাবঘরের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে হাত চেপে ধরেন আমারই বয়সি এক বয়স্ক মানুষ। 'আচ্ছা কাণ্ডজ্ঞান বলিহারি যাই! ঘরের সবাই অপেক্ষা করছে। বউদি ঘর-বার করছে। আগে তো ঘরে আসবেন। টিফিন করে তবে না মেলায় ঘোরা। মেলা তো পালাবে না। চলুন চলুন।'

এই হল আমার আত্মজন নীলমণি চক্রবর্তী। যার বাড়িতে অন্ন ও আশ্রয় পাক্কা, এই মেলার ক-দিন। ■

(ক্রমশ)

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৬-র জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে ৪০ র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র (আল-আমীন মিশনের মধ্যে প্রথম)

সাইফুল্লা সেখ

সবটাই আল-আমীনের অবদান

- তোমার নামধাম পরিচয় জানাও আমাদের।
- আমার নাম তো শুনেইছেন। তবু বলি। আমার নাম সাইফুল্লা সেখ। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ফলতা থানার অন্তর্গত গোবিন্দবাটী গ্রামে।
- কলকাতা থেকে কীভাবে যাও বাড়ি?
- ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ড হারবারগামী বাসে চড়ে নামতে হয় ফতেপুর স্টপেজে। ওখান থেকে অটো ধরে যেতে হয় গ্রামে।
- বাড়িতে কে কে আছেন?
- আব্বা-মা আর পাঁচ ভাই-বোন— এই আমাদের পরিবার। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দুই দিদি আর দাদার বিয়ে হয়ে গেছে।
- আব্বা-মার কী নাম? কী করেন?
- আব্বার নাম মোস্তাজ সেখ। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর হবে। পড়াশোনা ক্লাস ফোর পর্যন্ত। আগে দর্জির কাজ করতেন। এখন দোকানে দোকানে স্টেশনারি দ্রব্য সাপ্লাই করেন। সাইকেলে করে।
- আর মা?
- মায়ের নাম সাহানারা বিবি। পড়াশোনা এইট পর্যন্ত। বাড়িতেই থাকেন।
- ভাই-বোনেরা কী করেন? পড়াশোনা কতদূর?
- সবার বড়ো আমার দিদি। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। বিবাহিতা। তারপর দাদা। তাঁরও পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। দর্জির কাজ করেন। বিবাহিত। একটি সন্তান। তৃতীয় জন দিদি। পড়াশোনা মাধ্যমিক। বিয়ে হয়ে গেছে। আব্বা-মার চতুর্থ সন্তান আমি। ছোটোটা ভাই। ও ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে। গ্রামের স্কুলে।
- তোমার আব্বার ও দাদার কাজকর্ম সম্পর্কে তো জানলাম। আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আরও খানিকটা জানতে চাইছি। জমিজমার পরিমাণ, বাড়িঘরের অবস্থা কীরকম— এইসব।
- আমাদের ভিটেটুকু ছাড়া কোনো জমিজমা নেই। বাড়িঘরের বিষয়টা হল— দাদুর আমলের বাড়ি। দু-কামরা। মাটির। টালির ছাউনি দেওয়া।
- তোমার চাচাদের সঙ্গে ভাগ করে পাওয়া?
- না। আমার দুই চাচা। তাঁরা অন্যত্র থাকেন। ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন। দাদুর ভিটেতে আমরাই আছি।
- তোমাদের গ্রামের মানুষের পড়াশোনা-কাজকর্ম-আর্থিক অবস্থা কীরকম?

- আমাদের গ্রাম— মানে, আমাদের পাড়ার কথা বলি— পাড়ায় প্রায় একশো কুড়িটার মতো পরিবার বসবাস করে। ৯০ শতাংশ মানুষের জীবিকা দর্জির কাজ। বেশিরভাগ ছেলে ফাইভ-সিক্স বা সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়ে দর্জির কাজে লেগে যায়। আর মেয়েরা মাধ্যমিক পর্যন্ত যাওয়ার পর তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।
- তোমার পড়াশোনার কথা বলো এবার। এরকম পরিবেশের মাঝে তুমি কীভাবে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলে?
- আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম দুর্বারাট। ওই গ্রামের স্কুল— দুর্বারাট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি। তারপর আমাদের গ্রামেরই কাছাকাছি চালুয়াড়ি হাই স্কুলে ভর্তি হই। চালুয়াড়ি আমাদের পোস্ট অফিস।

- স্কুলে কেমন ফল হত? বরাবর ফার্স্ট হতে?
- না। প্রাইমারিতে আমি কোনোদিন ফার্স্ট হতে পারিনি। অন্য একটা ছেলে হত। হাই স্কুলের ভর্তির পরীক্ষায় যদিও আমি ওর থেকে ভালো ফল করি। ভর্তির পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে ছিলাম। আর ক্লাস ফাইভ থেকে ফার্স্ট হয়েছি।
- আল-আমীন মিশনে তাহলে কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলে?
- মাধ্যমিক দেওয়ার পর ক্লাস ইলেভেনে।
- তার মানে মাধ্যমিক চালুয়াড়ি হাই স্কুল থেকে—
- না। ওই স্কুলে আমি পড়ি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। তারপর মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করেছি।
- মামার বাড়ি থেকে কেন?
- আমি ক্লাস সেভেনে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি গেছি। মামার বাড়ি শেরপুরের কাছে বেড়ামারা গ্রাম। আমার মেজোমামা আবদুল হাফিজ মোল্লা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। টিউশনিও পড়ান। একদিন মামার সঙ্গে খেতে বসেছি, খেতে খেতে মামা অঙ্ক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করছেন, আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁর কী মনে হল জানি না, তারপর তিনি মাকে বলেন— গোবিন্দবাটীতে থেকে পড়াশোনা করলে আমার ক্ষতি হবে। তিনি তাঁর কাছে আমাকে ডেকে নেন। তাই মামার বাড়িতে থেকে ক্লাস এইট নাইন টেন পড়েছি আমড়াতলা গোসাঁইদাস হাই স্কুলে।
- নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়েছিল নাকি? ওখানে কীরকম পড়াশোনা করতে?
- প্রথম প্রথম সামান্য অসুবিধা হয়েছিল। ক্লাসের বন্ধুরা পাত্তা দিত না। তারপর অঙ্কের একটা ক্লাস-টেস্টে কুড়ির মধ্যে কুড়ি পাওয়ায় স্যার আলাদা করে আমাকে চিহ্নিত করেন। প্রশংসা করেন। তারপর সবাই ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে যায়। ওখানেও বরাবর প্রথম হয়েছি।
- এই পর্যায়ে তুমি কীভাবে পড়াশোনা করতে?
- আমাদের বাড়ি আর মামার বাড়ি— দুই জায়গাতেই স্কুলের টাইম আর বিকেল বেলাটা বাদ দিয়ে ভালোই পড়তাম। প্রথম থেকে রাত জেগে পড়াশোনা করতে পারতাম। তবে মামার কাছে এসে সেটা আরও বাড়ে।
- কীরকম?
- মামা সকাল-বিকেল-সন্ধ্যা— তিন টাইম টিউশনি করতেন। আমি তিন টাইমই একপাশে বসে পড়তাম। ব্যাচ চেঞ্জ হত কিন্তু আমি একভাবে পড়ে যেতাম।
- রাত জেগেও তো পড়তে বলছ। ধৈর্য রাখতে পারতে? ভালো লাগত?
- আমার পড়াশোনা করতে সবসময় ভালো লাগে।
- মাধ্যমিক দিলে কত সালে? কেমন রেজাল্ট হল?
- ২০১৩ সালে মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছিলাম ৬৩৩ নম্বর। ৯০.৩ শতাংশ। ২০১৫ পর্যন্ত ওটাই স্কুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর।
- আল-আমীন মিশনে কীভাবে এলে?
- মামা ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন। প্রথমে আমি পরীক্ষায় বসতে চাইনি। কারণ, কেমন হবে জানতাম না। মামা বললেন, আগে বসে দেখ চান্স হয় কি না। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাস করার পর ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য খলতপুরে ডাক পেলাম। মা-আব্বা আর মামা এসেছিলেন।
- খলতপুরে পা রেখে কেমন লাগল?
- আগে আল-আমীন মিশনের নাম শুনলেও ধারণা ছিল না। খলতপুরে এসে প্রাথমিকভাবে ভালোই লাগল, স্যার, মানে আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি ইন্টারভিউ শুরুর আগে একটা বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্য শুনে আরও ভালো লাগল।
- ইন্টারভিউয়ে কী হল?
- স্যার আমার মাধ্যমিকের নম্বর দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছ? তারপর অন্যান্য পড়ুয়াদের ব্রাঞ্চ ঠিক করে দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ব্রাঞ্চ নেবে। আমি পাঁচুড় নিয়েছিলাম।
- বেতনে ছাড়-টাড় পেয়েছিলে নাকি?
- হ্যাঁ। বলা যায়, আমি ফ্রিতেই পড়েছি মিশনে। যেখানে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা মাসিক ফিজ, সেখানে আমি দিতাম ৫৯০ টাকা।

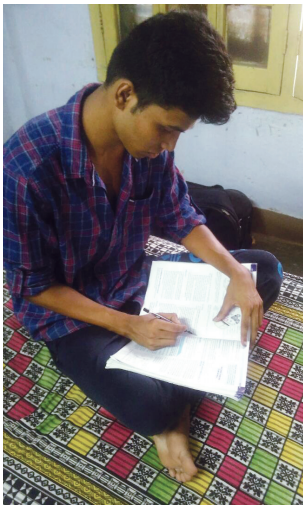

অল্প পড়াশোনার চল যে-পরিবারে, দর্জির কাজ যাদের রুটি জোগায়, যে-ছেলেটার আব্বা এখন একরকম হকারিই করে বলা যায়, সেই ছেলেটা এখন ডাক্তারি পড়ছে, এটা এখনও স্বপ্ন মনে হয় আমার পরিবার-আত্মীয়দের কাছে। এর কৃতিত্ব আল-আমীন মিশন আর আমার মামা আবদুল হাফিজ মোল্লার।

- আল-আমীন মিশনে কীভাবে পড়তে? প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়েছিল নাকি?
- প্রথমের দিকে আমার একদম ভালো লাগত না। দমবন্ধ লাগত। পাঁচুড়ে খেলাধুলা করার জায়গা নেই। গ্রামে প্রতিদিন বিকালে খেলতাম। পাঁচুড়ের হস্টেল থেকে বাইরেও যাওয়ার উপায় নেই। সপ্তাহে একবার কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া হয়। আমার মনে হত মিশনে এসে ভুল করলাম। এখন ভাবছি মিশনে এসে ভালোই হয়েছে। এই সময় হস্টেল-সুপার সাবির স্যার অনেক বুঝিয়েছেন আমাকে। পরে ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যায়।
- কীভাবে পড়াশোনা করেছ ওখানে?
- আল-আমীন মিশনের তো নিজস্ব রুটিন আছে। তার বাইরে বরাবর যেমন রাত তিনটে-সাড়ে তিনটে পর্যন্ত পড়তাম তেমন এখানেও পড়েছি।
- তাহলে বাড়িতে থেকে আর এখানে পড়াশোনা করার মধ্যে কী ফারাক দেখলে?
- বাড়িতে তো চাপ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, এখানে একটা বাড়তি প্রেসার থাকে। আর-একটা ভালো দিক— যেটা বাড়িতে হলে খুব অসুবিধা হত, তা হল, বাড়িতে থেকে দু-তিনটে বা চারটে বিষয়ে টিউশনি পড়তে গেলে পথেই সব সময় শেষ হয়ে যেত। সেলফ স্টাডির পরিসরটা ছোটো হয়ে যেত।
- মাধ্যমিকের সময়ও তা হওয়ার কথা তাহলে?
- না। আমার হয়নি। কারণ, আমার তো অত টিউশন ছিল না। বাইরে শুধু

ইংরেজিটা পড়তে যেতাম। বাকিটা মামার কাছে।

- আল-আমীনে এসে পড়াশোনার বাইরে আর কী কী শিক্ষা পেলে?
- নামাজটা ভালোভাবে শিখেছি। বাড়িতে ধর্ম বিষয়ে তেমন বিশেষ কিছুই শিখতে পারিনি, এখানে সেটা হয়েছে।
- উচ্চ-মাধ্যমিকে কেমন ফল হল তোমার?
- আমি ২০১৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দিই। পেয়েছিলাম ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর।
- কোন বিষয়ে কত পেয়েছিলে?
- ফিজিক্সে ৯৬, বায়োলজিতে ৯৬, কেমিস্ট্রিতে ৮৮, ম্যাথসে ৭২, ইংরেজিতে ৮৬, বাংলায় ৮৪ পেয়েছিলাম।
- অঙ্কে এত কম কেন?
- অঙ্ক আমার ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল। তাই জোর দিইনি অঙ্কের ওপর।
- ২০১৫-তে উচ্চ-মাধ্যমিক আর ২০১৬-য় জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাঙ্ক হয়েছে। রানিং ইয়ারে দাওনি জয়েন্ট?
- হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। ১৮৬০ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল।
- ১৮৬০ র‍্যাঙ্ক করে ভর্তির সুযোগ হয়নি?
- বিডিএস হচ্ছিল। নিইনি।
- যদি পরের বছর না হত, তাহলে তো সব যেত।
- এরকম ভাবিইনি। কারণ, জানতাম পাবই।
- ২০১৬ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে যে ৪০ র‍্যাঙ্ক হল, ভেবেছিলে এত ভালো ফল হবে?
- না, এতটা ভাবিনি।
- উচ্চ-মাধ্যমিকে বা জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যে-ফল হয়েছে, কী করলে আরও ভালো ফল হত?
- পরে দু-একবার আমারও এই প্রশ্নটা মনে ভেসেছে। ভেবে দেখেছি, আমি থিয়োরি বেশি পড়তাম, কোশ্চেন প্র্যাকটিস কম করতাম। যদি কোশ্চেন প্র্যাকটিসের ওপর জোর দিতাম তাহলে হয়তো আরও কিছু নম্বর বাড়তি পাওয়া যেত।
- কোন কলেজে ভর্তি হলে?
- মেডিকেল কলেজ, কলকাতা।
- এই যে এত ভালো ফল করে রাজ্যের সেরা কলেজে পড়ছ, এর পেছনে আল-আমীন মিশনের অবদান কতটা?
- সবটাই আল-আমীন মিশনের অবদান। মিশনে আসার আগে জানতামই না যে, জয়েন্ট দিয়ে ডাক্তারি পড়তে হয়। অল্প পড়াশোনার চল যে-পরিবারে, দর্জির কাজ যাদের রুটি জোগায়, যে-ছেলেটার আব্বা এখন একরকম হকারিই করে বলা যায়, সেই ছেলেটা এখন ডাক্তারি পড়ছে, এটা এখনও স্বপ্ন মনে হয় আমার পরিবার-আত্মীয়দের কাছে। এর কৃতিত্ব আল-আমীন মিশন আর আমার মামা আবদুল হাফিজ মোল্লার।
- তোমার নিজের কেমন মনে হয়েছিল প্রাথমিকভাবে?
- রেজাল্ট হাতে পেয়ে, ভর্তি হওয়ার পর মনে হয়েছিল, যাক, এবার আব্বা-মার কষ্ট কিছুটা কমাতে পারব।
- ভর্তি তো হয়েছে, খরচখরচা কীভাবে ম্যানেজ করছ?
- আব্বা-মা ঠিক কোথা থেকে ম্যানেজ করে রাখেন আমি জানি না। শুনেছি, নিজেরা জোগাড় করতে না পারলে মামাদের থেকে নেন। প্রয়োজনে চাচারাও পাশে থাকেন।
- স্কলারশিপ পাচ্ছ না?
- এখনও পাইনি। আবেদন করেছি। না পেলে খুব অসুবিধা হবে। দাদা-আব্বা সংসার চালিয়ে কীভাবে ম্যানেজ করবেন জানি না।
- একটা অন্য প্রশ্ন করে তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করব। এ-বছর থেকে সর্বভারতীয় পরীক্ষা হচ্ছে। এতে কী অসুবিধা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের, তোমার কী মনে হয়?
- না। অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। দুটো দিক— এক, ভাষাগত একটা সমস্যা হবে বলে প্রথমে ভাবা হয়েছিল। ইংরেজির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও পরীক্ষা দেওয়া যাবে, ফলে সে-সমস্যা থাকছে না। দ্বিতীয়ত, সিট বা ভর্তির সুযোগ কমে যাওয়া। এটাও আগের মতোই থাকছে। আগেও অন্য রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হত। নতুন নিয়মে ৮৫ শতাংশ আসন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। আর-একটা বিষয়— সিলেবাস। এটাতেও অন্তত আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা হওয়ার কথা না। কারণ, গত দু-তিন বছর থেকে এনসিইআরটির সিলেবাস ধরেই পড়ানো হচ্ছে।
- এবার শেষ প্রশ্ন— ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে চাইছ?
- আপাতত এমবিবিএসটাই ঠিকভাবে শেষ করতে চাইছি। অন্য কিছু ভাবছি না।
- ভালো থেকো। পরিবার-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করো।
- আপনারাও ভালো থাকবেন।

সেরার পরামর্শ

- প্রথমেই বলি, প্রত্যেকের নিজের পড়ার ধরন আলাদা। তাই কীভাবে পড়ছি না ভেবে, কী পড়ছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বই সামনে থাকলেই সবাই পড়ে, বই সামনে না থাকলেও পড়তে শিখতে হবে।
- কোনো চ্যাপ্টার শুরু করার আগে, সেই চ্যাপ্টারের কিছু প্রশ্ন করে নিলে চ্যাপ্টারটার কোশ্চেন কর্নারটা বোঝা যায়। পরে পড়ার সময় পারটিকুলার টপিকটাতে বাড়তি চাপ দেওয়া যায়।
- কেমিস্ট্রি ইনঅরগ্যানিক পার্টটা বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে নেগলেক্ট করে, অথচ ওখান থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রশ্ন আসে। ইন্টারেস্টিং জিনিস তো সবাই পড়ে, তাই কম্পিটিশনে এগোতে গেলে ওটা পড়তেই হবে, যেমনভাবে অরগ্যানিকটা পড়ে।
- ফিজিক্সের সমস্যা সমাধান করার সময় সময়ের ব্যাপারটা নজর রাখতে হবে। কোনো সমস্যায় আটকে গেলে সেটা বাদ দিয়ে অন্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে আর সময়ও বাঁচবে। একই ধরনের সমস্যার জন্য অ্যাডভান্স ফরমুলা তৈরি করতে হবে নিজের মতো করে।
- বায়োলজির এমসিকিউ প্র্যাকটিস করার সময় শুধু উত্তর জেনে বসে থাকলে হবে না, ওই টপিকটা পুরো বুঝতে হবে এবং আশেপাশের প্রশ্নের জন্য তৈরি হতে হবে।
- সব বিষয়ের সব টপিককে সমান গুরুত্ব দিতে হবে, মনে রাখতে হবে, সব প্রশ্নেই কিন্তু সমান নম্বর থাকে।
- বায়োলজি আর ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রির জন্য এনসিইআরটি খুব ভালো করে পড়তে হবে। এস ডি স্যার একটা কথা বলতেন, 'রিড নট অনলি দ্য ওয়ার্ডস, বাট বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস।' এনসিইআরটির এক-একটা শব্দ, এক-একটা ছবি অনেক কিছু বলে।
- পরীক্ষার হলটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রশ্নে আটকে গেলে, অন্যরাও এটা পারবে না ভেবে স্কিপ করো, সামনে আরও অনেক প্রশ্ন আছে। একটা কঠিন এমসিকিউ তোমার জয়েন্ট আটকাবে না।
- সর্বশেষ, অনেক অনেক পরিশ্রম করো। মনে রেখো, পরিশ্রম প্রতারণা করে না। আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখো, তুমিই জিতবে। ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

জাতির জীবনকে পূর্ণতা দেবে যারা

উর্ধ্বায়নের সাধনাই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। এই সাধনার বলে ব্যক্তি বৃহৎ হয়ে ওঠেন। এত বড়ো যে, একটা বিশাল আকাশের সীমাহীনতার মতো ব্যাপ্ত হতে পারে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভা। এমন উদাহরণ সুদূর অদূর ইতিহাসে কম নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা, সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজের আনাচকানাচ থেকে ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে দেখা যায় সম্ভাবনাময়, অথচ বহুকাল ধরে প্রতিকূলতায় প্রেরণাহীন পরিবেশে সুপ্ত হয়ে পড়ে থাকা সত্তা। যাদের প্রাণের গানে মুখরিত হতে চায় পৃথিবীর বাতাস। পৃথিবীর জলে মাটিতে যাদের প্রাণের হিল্লোল গড়ে তোলে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। সময় এমন সৌন্দর্যের দাবি নিয়ে অপেক্ষা করে। কে তাকে ভরিয়ে দেবে, কে তাকে সাজিয়ে দেবে নতুন আলোয় নবজীবনের রঙে।

আল-আমীন মিশন ব্যক্তি নয়, তবু তার বিশালতা বিরাট কোনো ব্যক্তিত্বের মহিমার দাবিদার। তার মহিমা এইখানে, সে আচ্ছন্ন একটা সমাজে আলোর ইশারা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। সে-আলোয় অন্ধ-কারা টুটছে, নতুন তারা ফুটছে। একটি-দুটি করে দিনে দিনে তারায় তারায় ছেয়ে উঠছে গোটা আকাশ। আকাশতলে প্রাণের স্ফূর্তি। একটা ম্রিয়মাণ সমাজের জীবন আজ প্রাণের আনন্দে মুখর হয়েছে। সে কি উল্লাসে বলছে না— আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। এমন তারার আলোয় এমন ফুলের সুবাসের মধ্যে বহুকালের সাধনা সত্য হতে চলেছে। সত্য হতে চলেছে জাগরণবেলার প্রার্থনা। জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া পরম কারুণিকের এই যে মাধুরী দান, এই দানকে হৃদয়ের সম্পদ করে ধরে রাখতে হবে। একে হারালে চলবে না। এই সম্পদই জাতির জীবনকে পূর্ণতা দেবে। জগৎসভায় প্রতিষ্ঠা দেবে সম্মানের সিংহাসনে।

মহাফিজুর সেখ।

যে-আলোর গৌরবে এত কথা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে, তার চারটি কণা নিয়ে আজ আমরা কথা বলব। আলাপে-পরিচয়ে আমরা জানব তাদের অতীত, জেনে নেব বর্তমানের পরিস্থিতি আর ভবিষ্যতের কল্পনা। দেখে নেব ওদের মুখের আড়াল থেকে স্বপ্নের মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি না?

মহাফিজুর সেখ। যার কথা দিয়ে শুরু করব আজকের আলোচ্য চার জনের কথা ও কাহিনি। না, কথাও নয়, কাহিনিও নয়— ওদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। শুধু কি স্বপ্ন সম্ভাবনা? নয় কি ওদের উদ্‌বোধনের গল্প। গল্প কেন হবে— সত্যি। এত বড়ো সত্যি আর কী আছে, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো পারিবারিক অবস্থা, তারা কিনা পরমান্ন গ্রহণের জন্য কঠোর ব্রত পালন করছে। তার জন্য কত-না কৃচ্ছ্রসাধন। কত যে কষ্ঠের সাধনার ভেতর দিয়ে সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে মানুষ, তা আমরা মহাজীবনকথার পাতায় পড়েছি। কিন্তু ছোটো ছোটো মানুষের ছোটো ছোটো স্বপ্ন যখন জোনাকির বিন্দু বিন্দু আলোর মতো ক্রমশ অন্ধকার ভেদ করে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে এগিয়ে চলে, তখন তাকেও অভিনন্দন জানাতে হয়। তার দিকেও ভাসিয়ে দিতে হয় শুভ ইচ্ছার সুরভি।

যার কথা বলব বলে শুরু করেছিলাম। মহাফিজুর সেখ। জন্ম ২০০০ সালে— গত সহস্রাব্দের শেষ বর্ষে। তার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার উপরডিহা গ্রাম। এইসব গ্রাম সাধারণভাবে দারিদ্র্যপীড়িত। বলা যায়, এইসব জায়গার জাতকেরা আজও অনেকটা নিয়তিনির্ভর। সুখের কথা, নিয়তিনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আজ ওদের মধ্যে শুরু হয়েছে কঠোর ব্রতধারণ। এমন ব্রতধারীদের একজন মহাফিজুর। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা আবদুল সালাম সেখ তার বাবা। সামান্যই তাঁদের কৃষিযোগ্য জমি। তাতেই আগে অল্পবিস্তর চাষবাস করতেন। আয় যা হত, বলাই বাহুল্য, তা নামমাত্র। কোনোরকমে সংসার চলে যায় আর কী। আর মহাফিজুরের মা আতর বানু বিবি ছয় ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। মহাফিজুরের এক ভাই, সে এখন উপরডিহা গ্রামের স্কুলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ওদের পাতলা ইটের দেয়াল দেওয়া টালির ছাউনির বাড়ি। তার মানে, সবমিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মহাফিজুরেরা সাধারণের চাইতেও সাধারণ পরিবারের। এই সাধারণত্বের ভেতর দিয়ে আজ ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছে মহাফিজুরের অসাধারণ গুণের দিক। সে-গুণ অধ্যবসায়ের মূল্যে মূল্যবান। সে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা

মহম্মদ আফাজ উদ্দিন।

দিয়েছিল আল-আমীন মিশনের দুবরাজপুর ক্যাম্পাস থেকে। প্রাপ্ত নম্বর ৬৩৪, অর্থাৎ ৯০.৫৭ শতাংশ। অঙ্কে পেয়েছিল একশোর মধ্যে একশো। জীবনবিজ্ঞানে ৯৭। যদিও পদার্থবিদ্যা তার প্রিয়তম বিষয়। মহাফিজুর অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম ভর্তি হয় আল-আমীনে। তার আগে থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল এক শিশু-মাদ্রাসা আর চতুর্থ শ্রেণি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। এবং পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত গ্রামের হাই স্কুলে, ওর ভাই এখন যে-স্কুলের পড়ুয়া। বরাবরের মেধাবী মহাফিজুর এখন দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে আল-আমীনের বর্ধমান বালক শাখায়। ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। তবে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার স্বপ্নও তার মনে উঁকিঝুঁকি মারে। দিগন্তপ্রসারী খেতিজমির দিকে তাকিয়ে তার সে-স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলতে চায় অনেক বড়ো এক আকাশ।

লতিফা খাতুন।

মহাফিজুরের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন তার পাশটিতে খুব আত্মস্থভাবে বসেছিল, আর তনু-মন-প্রাণে আমাদের কথোপকথন শুনছিল যে-ছেলেটি, তার নাম মহম্মদ আফাজ উদ্দিন। আফাজ, সেও আল-আমীনের বর্ধমান বালক শাখায় এখন দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নিই তার পরিচয়ের দু-এক কথা। আফাজও ২০০০ সালের জাতক। জন্ম বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের হেরুকা গ্রামে। বাবার নাম মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। তিনি ইতিহাসে সাম্মানিক স্নাতক। কিন্তু চাকরি করেন না। মানে চাকরি পাননি। যুক্ত আছেন কৃষিকাজের সঙ্গে। নিজের জমিতে ধান গম সরিষার চাষ করে উপার্জন করেন। অষ্টম শ্রেণি পাস তাসলিমা বিবি তার মা। আফাজের এক ভাই আর এক দিদি। ভাই এখন আল-আমীন মিশনের সুগড় শাখার ছাত্র। তাদের ইটের দেয়ালওয়ালা টিনের চালার ছোটোখাটো বাড়ি। আফাজ ফোর পর্যন্ত পড়েছে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে গ্রামের সরকারি হাই স্কুলে। এরপর সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয় আল-আমীনের পাইকপাড়ি ক্যাম্পাসে। ওখান থেকে ২০১৬-য় দেয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। পেয়েছিল ৬০৯ নম্বর, অর্থাৎ ৮৭ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ভৌতবিজ্ঞানে— একশোয় একশো। আর জীবনবিজ্ঞানে ৯৬। তবে প্রিয় বিষয় অঙ্ক। এরও ইচ্ছে ডাক্তার হওয়ার। তবে গণিতবিদ হওয়ার স্বপ্নও মনের মধ্যে লালন করে চলেছে মেধাবী এই ছাত্র। অবসর-বিনোদনের সঙ্গী গান। বলতে বলতে অরিজিৎ সিঙের গাওয়া একটা গান তার ঠোঁটের কিনার থেকে যেন গুনগুন করে উড়ে এল।

এরপর কথা হল দুজন ছাত্রীর সঙ্গে। দুজনেই আল-আমীনের বর্ধমান বালিকা শাখায় পড়ছে। দুজনেই দ্বাদশ শ্রেণি, দুজনেই বিজ্ঞান বিভাগ। লতিফা খাতুন তাদের একজন। ১৯৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর লতিফার জন্ম বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার ব্লকের সারেঙা গ্রামে। বাবা মহম্মদ আমিরুল হক চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ধানচাষ তাঁর জীবিকা। নিজস্ব অল্প কিছু জমিতে যা ফলন হয়, তাতেই কোনোপ্রকারে সংসার নির্বাহ হয়। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা হাজেরা বিবি লতিফার মা। লতিফা গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। তারপর থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত গ্রামের হাই স্কুলে। লতিফার এক সম্পর্কিত দাদা আল-আমীনে পড়তেন, এবং তিনি রানিং ইয়ারে ডাক্তারি পড়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই পথ ধরে লতিফার আল-আমীনে পড়তে আসা। নয় ক্লাসে ভর্তি হয় পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছিল ৫৭০ নম্বর। শতকরা হিসেবে ৮১.৪৭। জীবনবিজ্ঞানে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৪ এবং ওটাই তার বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর। কিন্তু তার সবচাইতে ভালো লাগার বিষয় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। বস্তু ও বস্তুর ধর্ম নিয়ে তার অপার কৌতূহল। কিন্তু সে ডাক্তার হতে চায়। সোজাসুজি একটা কারণ দেখাল— তার মা-বাবার ইচ্ছে, সে যেন ডাক্তার হতে পারে। তারও চেয়ে বড়ো কথা, ডাক্তার হলে হয়তো অল্প সময়ের উপার্জনে পরিবারের দুস্তর দারিদ্র্য ঘোঁচাতে পারবে সহজে। তার স্মৃতিতে এক সময়ের এমন দারিদ্র্যের ছায়া দেখা দিল, যা চোখে জল এনে দেয়, যেদিন তাদের পরিবারে কোনো কোনো বেলা সামান্য একটুও খাবার জুটত না। সেই দুর্বিষহ অবস্থা মোচনের পথে আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে লতিফা। তার জন্য আল-আমীন মিশনের কাছে তার কৃতজ্ঞতার কথাটি লুকিয়ে রাখতে পারল না। শান্ত প্রকৃতির লতিফা ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথের গান।

এবারের প্রতিবেদন শেষ করব খাদিজা পারভিনের কথা বলে। ২০০০ সালের দোসরা জানুয়ারি জন্ম খাদিজার। বীরভূম জেলার নলহাটী শহরের মধ্যে ওদের বাড়ি। বাড়ি বলতে ইটে গাঁথা দেয়ালের ওপর টিনের চালা। বাবার পেশা বিড়ির ব্যাবসা। তার বাবা খাইরুল বাসারের লেখাপড়া চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। মায়েরও লেখাপড়া তা-ই। মায়ের নাম রাকিবা বিবি। পরিবারের অবস্থা তথৈবচ। অথচ রাকিবাকে তার মা-বাবা লেখাপড়া শিখিয়ে আধুনিক আর প্রগতিশীল পৃথিবীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। শুধু স্বপ্ন দেখেন নয়, তা বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের দিক থেকে যা করার, তা-ই করেন। রাকিবা বুনিয়াদি শিক্ষা পেয়েছে নলহাটী শহরের একটি প্রাইমারি স্কুল থেকে। তারপর পঞ্চম শ্রেণিটা পড়েছে নলহাটী হাই স্কুল ফর গার্লসে। আর সিক্স থেকে এইট রহমতে আলম মিশনে। আকাঙ্ক্ষা ছিল আল-আমীন মিশনে পড়বে। আল-আমীনে নবম শ্রেণির ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাস করে এবং ভর্তি হয় মিশনের পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাসে। ওখান থেকে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছে ৫৫৮ নম্বর, অর্থাৎ ৭৯.৭১ শতাংশ। নম্বরটা এক হিসেবে তেমন বেশি নয়, আবার আর-এক হিসেবে এমন কিছু কমও নয়। এরকম কথা উঠতে স্বভাবে ছটফটে খাদিজা বলল, এই তিন বছরে আল-আমীনের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের প্রভাবে যতটা উন্নতি হয়েছে তার, তার ভিত্তিতে আশা করা যায় উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করবে। আগামী বছর, ২০১৮-য় সে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ডাক্তার হওয়ার জন্য তো এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু তার অপর একটি স্বপ্ন আছে— অধ্যাপিকা হওয়ার স্বপ্ন। রসায়ন সবচেয়ে ভালো লাগে। রসায়নের অধ্যাপিকা হয়ে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারলে সবচাইতে খুশি হবে সে। শুধু তার খুশির জন্য নয়, ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ের মূল্যে তার এ-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় পূরণ হবে। ■

খাদিজা পারভিন।

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

ট্রোজান হর্স

কম্পিউটার নিয়ে যাঁরা অহরহ কাজ করেন ট্রোজান (Trojan) শব্দটি তাঁদের কাছে বিমূর্ত আতঙ্ক। ট্রোজান হর্স ভাইরাস কম্পিউটারের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু ভাইরাসটির নাম এমন কেন? হর্স মানে তো ঘোড়া। ট্রোজান হর্স কী? জানতে চাইলে যেতে হবে সুদূর অতীতে। ট্রয় নগরী ধ্বংসের সময়। বা হোমারের অমর মহাকাব্য 'ইলিয়ড' লেখার যুগে।

সময়টিকে এককথায় ব্রোঞ্জ যুগ বলা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৬০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১১৮০ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে কম করেও তিন হাজার বছর আগের ঘটনা।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার সংক্রান্ত বহু শব্দ আছে, যে-শব্দগুলো হাজার হাজার বছরের পুরোনো। এর থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানবসভ্যতার কোনোকিছুই আকাশ থেকে পড়েনি। সবই এসেছে বা অর্জিত হয়েছে মানুষের বহু হাজার বছরের পরিশ্রম আর জ্ঞানের দ্বারা। এমনকী আজকের স্মার্টফোনটাও।

সেসব না হয় হল, কিন্তু ট্রোজান শব্দটার মানে কী? ট্রয়ের বাসিন্দাদের বলা হত ট্রোজান। যেমন কলকাতার বাসিন্দাদের ক্যালকাটান। মহাকবি হোমার 'ইলিয়ডে' ট্রোজান শব্দটি ব্যবহার করেননি। লাতিন মহাকাব্য 'ইনিডে' মহাকবি ভার্জিল প্রথম লেখেন ট্রোজান শব্দটি। সেটা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কথা। গ্রিক সম্রাট অগাস্টাসের সময়। আর হোমারের সময়টি ঐতিহাসিকভাবে না-জানার কারণে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী পাঁচশো বছর ধরে ছড়িয়ে আছে। ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে যেতে হবে তুরস্কে। এটি এখন ওই দেশের আনাতোলিয়ার গর্ব। প্রাচীন হেলেনিক সভ্যতার নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থানটির বর্তমান তুর্কি নাম হিসারলিক।

কিন্তু ট্রয় ধ্বংসের মূল গল্পটি কী?

ট্রয়ের যুদ্ধ গ্রিক পুরাণের একটি অতি জনপ্রিয় বিষয়। গ্রিক কবি হোমারের 'ইলিয়ডে' সেই যুদ্ধের মাত্র কয়েক দিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ট্রয়ের যুদ্ধের সূত্রপাত হয় স্পার্টার রানি হেলেনের অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মূল ঘটনার সূত্রপাত আরও পেছনে।

হোমার নন, অন্য গ্রিক কবিরা (যেমন— আপোলোডোরাস, ইস্কাইলাস, ইউরিপিদেস) তাঁদের কালজয়ী সাহিত্যকর্মে ট্রয়ের যুদ্ধের আগের ও পরের কাহিনির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে লিখেছেন। সেইসব কাহিনিসূত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, দেবতাদের আবাস অলিম্পাসে তিন রূপসী দেবীর মধ্যেকার এক বিবাদ থেকেই এই কাহিনির সূত্রপাত। বিয়ে হবে রাজা পিলিউস এবং জলদেবী থেটিসের। সেই বিয়ের ভোজসভায় কলহের দেবী এরিস বাদে নিমন্ত্রণ পেলেন অন্য সকল দেব-দেবী। অপমানিতা দেবী এরিস সংকল্প করলেন, যে করেই হোক বিবাহসভায় একটা ভেজাল বাধাবেন। তিনি ভোজসভায় গিয়ে টেবিলের ওপর একটি সোনার আপেল রাখলেন, যাতে খোদাই করা ছিল একটি কথা— 'কেবলমাত্র সুন্দরীশ্রেষ্ঠার জন্য'। সকল দেবীই এর দাবিদার হলেন, কেননা, প্রত্যেকের মতেই তিনিই সবচেয়ে সুন্দরী। অবশেষে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় নামলেন দেবী হিরা, এথিনা এবং আফ্রোদিতি। হিরা সম্পদের দেবী, এথিনা জ্ঞানের এবং আফ্রোদিতি প্রেমের দেবী। তাঁরা ফলাফলের জন্য গেলেন দেবরাজ জিউসের কাছে। এদিকে হিরা আবার তাঁর স্ত্রী। জিউস দেখলেন, হিরাকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হিসেবে ঘোষণা না করলে গোলযোগ বাধবে, আবার হিরার পক্ষে রায় দিলে পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাবে। তাই তিনি বিচারের ভার দিলেন মনুষ্যকুলের হাতে। ঠিক হল, পৃথিবীর কোনো মানুষের হাতে আপেলটি তুলে দেয়া হবে। সে যে-দেবীর হাতে আপেলটি তুলে দেবে, তিনিই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

তিন দেবী নেমে এলেন স্বর্গ থেকে। দেবীরা ট্রয়ের তরুণ প্যারিসের হাতে আপেলটি দিয়ে বললেন, 'আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী, তাঁর হাতেই আপেলটি তুলে দাও। আমরা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করলাম।'

ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী।

বললেন বটে, তবে প্যারিসকে লোভের ফাঁদে ফেলে প্রত্যেক দেবীই সফল হতে চাইলেন। হিরা তাঁকে ইউরোপ এবং এশিয়ার অধীশ্বর বানিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এথিনা দিতে চাইলেন পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান এবং দেবী আফ্রোদিতি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে তাঁর প্রণয়িনী বানিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। প্যারিস পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আপেলটি তুলে দিলেন প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির হাতে। ইংরেজি প্রবাদ Apple of discord (বিবাদের বিষয়) এই ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হেলেন ছিলেন ভূখণ্ডে রূপে অদ্বিতীয়া। স্বয়ংবরসভায় সেই হেলেনকে জিতে নিলেন মাইসিনির রাজা আগামেমননের ভাই মেনিলাউস। হেলেনের পিতা টিনডারিয়ুস কন্যা সম্প্রদান করলেন মেনিলাউসের হাতে এবং তাঁকে স্পার্টার রাজা ঘোষণা করলেন। এদিকে, দেবী আফ্রোদিতি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্যারিসকে হেলেনের সন্ধান দিলেন। প্যারিস তাঁর বন্ধুদের নিয়ে জাহাজ সাজিয়ে রওনা দিলেন স্পার্টার দিকে। ততদিনে তিনিও জেনে গেছেন, তিনি সাধারণ মেষপালক নন, আসলে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র। যাই হোক, রাজা মেনিলাউস প্যারিসকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বন্ধুদের নিয়ে ভোজসভায় খেতে বসলেন প্যারিস। তখন সেখানে প্রবেশ করলেন রানি হেলেন, পৃথিবীতে যাঁর রূপের তুলনা নেই। দেখামাত্র দু-জনই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। আসলে পুরোটাই ছিল দেবী আফ্রোদিতির কারসাজি।

এক দিন রাজকার্যে বাইরে যেতে হল হেলেনের স্বামী মেনিলাউসকে। এই সুযোগেই ঘর ছাড়লেন হেলেন, প্যারিসের হাত ধরে। জাহাজ পাল তুলে দিল ট্রয়ের দিকে। অপমানিত, ক্রুদ্ধ মেনিলাউস অন্যান্য রাজাদের সহযোগিতায়, তাঁদের পাঠানো সৈন্যদল নিয়ে বিশাল মিত্রবাহিনী গড়ে তুলে ট্রয় নগরী আক্রমণ করলেন। প্রায় নয় বছর স্থায়ী হয়েছিল ট্রয়ের যুদ্ধ, যা সমৃদ্ধ নগরীটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

বিধ্বংসী সেই যুদ্ধে এথেনীয়দের প্রধান কৌশল ছিল কাঠের তৈরি বিশাল ঘোড়া, যার ভেতরটা ফাঁপা, যেখানে বহু সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিছুতেই ট্রয় কবজা করা যাচ্ছে না, তারা ফিরে যাওয়ার ভান করে সেই ঘোড়াটি ট্রয়বাসীদের দেবতার উদ্দেশে উপহার দেয়। ট্রোজানরা ঘোড়াটি সাগ্রহে গ্রহণ করে। এর পরই বাধে বিপত্তি। রাতের অন্ধকারে সেই ঘোড়ার পেট থেকে একে একে বেরিয়ে আসে এথেনীয় বীরের দল এবং দুর্গের গেট খুলে দেয় আর বাকি সৈন্যরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ট্রয় নগরী ধ্বংস করে।

ট্রোজান হর্স ভাইরাসের কৌশলও তেমনই। এও ঠিক সেই কাঠের ঘোড়াটির মতোই কাজ করে। সরল মনে আমি হয়তো কোনো দুষ্ট বন্ধুর দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কম্পিউটারের পুরো নিয়ন্ত্রণ সে নিয়ে নিল। আমি টেরটিও পেলাম না। টের যখন পাব, ততক্ষণে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ট্রোজান হর্স ভাইরাস আমার সম্মতি ছাড়া পিসিতে কাজ করতে পারে না। ট্রয়বাসীরা যদি নগরে ঘোড়াটি না-ঢোকাত, তবে তাদের ওই অবস্থা হত না। অনেকটা খাল কেটে কুমির আনার মতোই আমরা ট্রোজান হর্স ভাইরাস ডেকে আনি। সেই জন্যই মহাকাব্যের সেই ঘোড়া থেকে এই ভাইরাসের নামকরণ হয়েছে ট্রোজান হর্স।

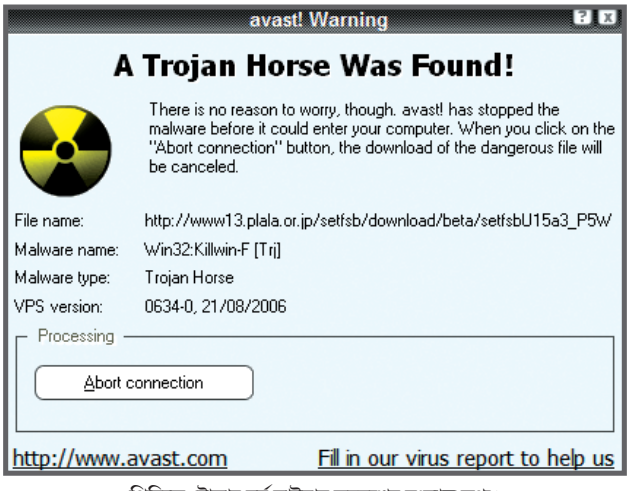

পিসিতে ট্রোজান হর্স ভাইরাস অনুসন্ধান সংক্রান্ত তথ্য।

খামের এককোণে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো। চৌকো টুকরোতে কীসব ছাপা। মাঝে একটা ছবি, তার একপাশে দেশের নাম আর কিছু পয়সা বা টাকার উল্লেখ। ওই কাগজের টুকরোটি আঠা দিয়ে আটকানো না-থাকলে খামটি প্রাপকের কাছে পৌঁছোবে না। ওটাকেই আমরা বলি ডাকটিকিট। ইংরেজিতে পোস্টেজ স্ট্যাম্প। প্রথাটি কবে থেকে চালু হল?

একশো ছিয়াত্তর বছর আগে। ইংল্যান্ডে। দিনটি ছিল পয়লা মে, আঠারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ। এক পেনি মূল্যের ওই ডাকটিকিটটি এখন পেনি ব্ল্যাক নামে জগদ্‌বিখ্যাত। বাজারে যার একটির দাম কম করেও চার লাখ তেষট্টি হাজার মার্কিন ডলার। পেনি ব্ল্যাকে অবশ্য দেশের নাম উল্লেখ ছিল না। ডাকব্যবস্থাকে আধুনিক করতে স্যার রোল্যান্ড হিলের মস্তিষ্কপ্রসূত এই ডাকটিকিট ছিল নিতান্ত সাদামাটা। কালো প্রেক্ষাপটে তরুণী রানি ভিক্টোরিয়ার

মুখটি সরলভাবে রেখাঙ্কিত। হালফিলের মতো সুন্দর রংচঙে নয়। তবু আজ এত দাম কেন? দামের কারণ এর দুষ্প্রাপ্যতা। সে-প্রসঙ্গ অন্য।

কিন্তু একেবারে রানির মুখের ছবি ছাপা ওই যে ডাকটিকিট, ওটা কি আকাশ থেকে পড়ল? না। শুরুরও শুরু আছে।

আমরা জানি, ভারতে ডাকব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন সম্রাট শের শাহ সুরি। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। সেটা ছিল মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা। পরে ইউরোপে এই ব্যবস্থা একটু একটু করে উন্নত হয়। শুরুর দিকে সমস্যা দেখা দিল যে, যিনি চিঠি পাঠাচ্ছেন, তিনি ডাকমাশুল দেবেন, না কি যিনি প্রাপক? প্রাপক মাশুল দিতে অস্বীকার করলে? বাস্তবিক করতেনও তা-ই। এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকত। এই সমস্যা দূর করতে ষোলোশো আশি সালে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী উইলিয়ম ডকওরা এবং তাঁর পার্টনার রবার্ট মারে লন্ডন শহরের মধ্যে চিঠি আর ছোটো পার্সেল পৌঁছে দিতে চালু করেন লন্ডন পেনি পোস্ট। এটা ছিল প্রিপেড ব্যবস্থা। মাত্র এক পেনি খরচে তাঁরা কাজটি করতেন এবং শুল্কটি নিতেন প্রেরকের কাছে। আলাদা একটি টুকরো কাগজে স্ট্যাম্পছাপ দেয়া হত ওই এক পেনির প্রাপ্তিস্বীকার করে। পরে বহু ঐতিহাসিক ওই স্ট্যাম্পকেই বলেছেন পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট।

ডাকটিকিট আবিষ্কারকের দাবিদার কিন্তু কম নয়। লভরেঙ্ক কোসির নামে লুবলিয়ানার এক নাগরিক পোস্টাল ট্যাক্স স্ট্যাম্প চালুর চেষ্টা করেছিলেন আঠারোশো পঁয়তিরিশ সালে। তখন লুবলিয়ানা ছিল হাঙ্গেরির মধ্যে। এখন লুবলিয়ানা জায়গাটি স্লোভেনিয়ার অন্তর্গত। রোল্যান্ড হিলের নাম তো আমরা করেছি পেনি ব্ল্যাকের সূত্রে। এ ছাড়া জেমস চ্যালমেরস নামে এক স্কটিশেরও দাবি রয়েছে ডাকটিকিটের আবিষ্কারক হিসেবে। আরও যেসব নাম এই সূত্রে উঠে এসেছে বার বার, সেগুলো হল— ড. জন গ্রে (ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তা), স্যামুয়েল রবার্টস (স্কটিশ ট্যাক্স অফিসার), চার্লস হোয়াইটিং (লন্ডনের এক ব্যবসায়ী), ক্যারি গ্যাব্রিয়েল ট্রেফেনবার্গ (সুইডেনবাসী) এবং আরও কেউ কেউ।

ভারতে প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় কবে?

আঠারোশো সাঁইতিরিশ সালে ভারতে ব্রিটিশ ডাকব্যবস্থার প্রচলন হলেও প্রথম ডাকটিকিটটি ছাপা হয় আঠারোশো বাহান্ন সালে। সিন্ধুপ্রদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান স্যার বার্টল ফ্রেরের উদ্যোগে। সিন্ধ ডক নামে পরিচিত ডাকটিকিটটির জন্ম ইংল্যান্ডের পেনি ব্ল্যাকের বারো বছর পরে। তার আগে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে চালু হলেও সিন্ধ ডকই এশিয়ার প্রথম ডাকটিকিট। এমনকী ব্রিটিশ উপনিবেশ মরিশাসেরও আগে। আঠারোশো ষাট সালের মধ্যে ডাকব্যবস্থায় স্ট্যাম্পের প্রচলন বেশ ছড়িয়ে পড়ে।

এই যে ছড়িয়ে পড়ল, সুন্দর সুন্দর ডাকটিকিটে বাজার ছেয়ে গেল। এর ফলে হল কী, একদল মানুষ এইসব ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এটা হয়ে দাঁড়াল তাঁদের হবি বা নেশা। দুনিয়া জুড়ে সংগ্রাহকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় তৈরি হল ব্যবহৃত ডাকটিকিটের বাজারও। কার সংগ্রহের ডাকটিকিট কতটা সুন্দর, কত দুষ্প্রাপ্য— সেই নিরিখে দামও নির্ধারিত হতে লাগল। কালে কালে বিরাট এক বাজার আজ তৈরি হয়ে গেছে ব্যবহৃত ডাকটিকিটের। হাজার হাজার কোটি টাকার বাজার। আর এই বাজারকে ঘিরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন একদল বিশেষজ্ঞও। তাঁরা জহুরির মতো চোখে চিনে নেন আসল ডাকটিকিটটি। তার বিশিষ্টতা। এই কাজটি করতে গেলে খোঁজ রাখতে হয় দুনিয়ার যত দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটের। তাদের বাজারদরের। এই দর কে বা কারা নির্ধারণ করে? এখন বাজারটি নিয়ন্ত্রণ করে বিখ্যাত নিলামদাররা। যত দামি ডাকটিকিট, তত বড়ো নিলামদার। আর জানেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা যেমন জানেন, ভারতের সবচেয়ে দামি ডাকটিকিট উনিশশো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর ডাকটিকিটগুলির কোনোটার দাম নয় লাখ টাকারও বেশি, তেমনই জানেন যে, ওইসব ডাকটিকিটের অনেক নকলও বেরিয়ে গেছে।

কয়েকটি বহুমূল্য ডাকটিকিট, দুষ্প্রাপ্যতার কারণে যেগুলোর দাম আকাশছোঁয়া— ব্যাসেল ডোভ স্ট্যাম্প, ব্রিটিশ গুয়ানা ১সি ম্যাজেন্টা, হাওয়াইয়ান মিশনারিজ, ইনভার্টেড হেড ৪ অ্যানাস, ইনভার্টেড জেনি, মরিশাস পোস্ট অফিস, পেনি ব্ল্যাক, রেড রেভিনিউ স্মল ওয়ান ডলার, সিন্ধ ডক, ট্রেসকিলিং ইয়ালো।

হাইওয়ে

কত রকমের যে রাস্তা! হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, স্ট্রিট, রোড, রাজপথ, জনপথ, অ্যাভিনিউ, লেন, বাই লেন, ব্লাইন্ড লেন, রাজ্য সড়ক, জেলা পরিষদের রাস্তা, পঞ্চায়েতের রাস্তা— শুধু দেশ নয়, সারা জগৎটাই হিজিবিজি রাস্তা দিয়ে নকশা কাটা। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এশিয়ান হাইওয়ে। এত যে পথ, দেশ জুড়ে সবচেয়ে গুরুত্ব কোন রাস্তার? এককথায়— ন্যাশনাল হাইওয়ের। সারা দেশকে অজস্র দড়িতে বাঁধবার কাজটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে করে আমাদের জাতীয় সড়ক।

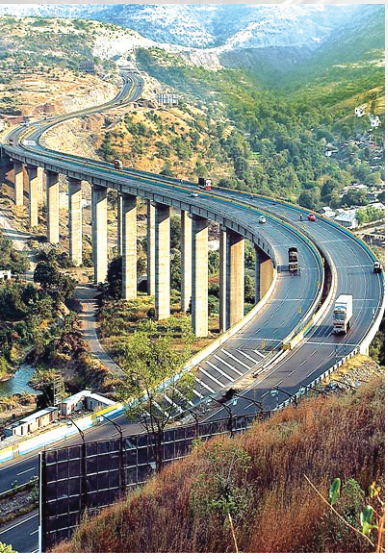

অথচ দেশের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য যেখানে ৪,২৪৫,৪২৯ কিলোমিটার, সেখানে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ১০০, ০৮৭ কিলোমিটার। কিন্তু দেশের সমস্ত রাস্তার মাত্র ১.৭ শতাংশ জাতীয় সড়ক হলেও মোট যানবাহনের প্রায় ৪০ শতাংশেরই চাপ নিতে হয় জাতীয় সড়ককেই। এমনই অসম চাপের মুখে আমাদের জাতীয় সড়কগুলি। এই সড়কগুলি তৈরি এবং দেখাশোনা করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে এনএইচএআই। সবচেয়ে দীর্ঘ জাতীয় সড়কটি ছড়িয়ে আছে জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী পর্যন্ত। এনএইচ-৪৪ বা চুয়াল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৭৪৫ কিলোমিটার। রাস্তাটি গেছে এগারোটি রাজ্যের ওপর দিয়ে। আর, সবচেয়ে ছোট্ট রাস্তাটি? এর্নাকুলাম থেকে কোচি বন্দর পর্যন্ত যাওয়া জাতীয় সড়কটি মাত্র ৬ কিলোমিটার। নাম? এনএইচ-৯৯বি। আচ্ছা, গ্র্যান্ট ট্র্যাঙ্ক রোডটির এখন নাম কী? এনএইচ-২। পরে দেখব, এই রাস্তাটিই আবার কোথাও হয়ে গেছে এনএইচ-১।

জাতীয় সড়ক মোটের ওপর তিন রকমের। সিঙ্গল লেনের, ডবল লেনের, চার বা তার বেশি লেনের। চেষ্টা চলছে সব জাতীয় সড়ককে অন্তত ডবল লেন করা। লক্ষ্য অবশ্য কমপক্ষে চার লেনের প্রসারের দিকে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু, আমরা যে এশিয়ান হাইওয়ের কথা আগে বলেছি, সে-রাস্তা কেমন? এশিয়ান হাইওয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এএইচ। যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ের এনএইচ। তারপর নম্বর— এনএইচ-১, এনএইচ-৩৪। এশিয়ান হাইওয়েরও রয়েছে নম্বর। যেমন পৃথিবীর দীর্ঘতম রাস্তাটির নাম এএইচ-১। মোট দৈর্ঘ্য ২০,৫৫৭ কিলোমিটার। কম কথা নয়! জাপানের রাজধানী তোকিয়ো থেকে রাস্তাটি শুরু হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরে মায়ানমার থেকে ঢুকেছে আমাদের দেশে, মিজোরামে। তারপর মেঘালয়ের সীমান্ত পেরিয়ে গেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ থেকে বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত পেরিয়ে ফের ঢুকেছে ভারতে, মানে আমাদের

বাংলায়। ভারত পেরিয়ে চলে গেছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, আজারবাইজান হয়ে তুরস্কের ইস্তানবুলে। সেখান থেকে বুলগেরিয়ায় ঢুকে ই-৮০ পথ ধরে গেছে পর্তুগালের লিসবনে। সেই আটলান্টিক-তীরে। শুরু কোথায় যেন হয়েছিল? প্রশান্ত মহাসাগরে না? হ্যাঁ। আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি? আমরা জানিই না, আমাদের দেশের ওপর এশিয়ান হাইওয়ে রয়েছে ছ-ছটি! তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক? আজ যদি না হয়, কাল বা পরশু বা কোনো-এক দিন। ■

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ— কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

দেশ

পে রু

নোবেল-বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদার বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ 'মাচু-পিচুর শিখর থেকে'। এই কবিতায় মাচু-পিচু নামক এই শহরের উচ্চতম বিন্দু থেকে সমগ্র লাতিন আমেরিকার ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি। বিশ্লেষণ করেছিলেন তাদের সভ্যতাকে। লাতিন আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা

মহাদেশ বার বার নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গেছে। মহামারি, যুদ্ধ, দারিদ্র্য বার বার আক্রমণ করেছে। বার বার মুক্তির জন্য চেষ্টা হয়েছে। হয়েছে রক্তাক্ত বিপ্লব। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার স্পৃহাকে নষ্ট করতে পারেনি। বার বার তারা গর্জে উঠেছে, লড়েছে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে।

মাচু-পিচু যে-দেশটিতে অবস্থিত, তার নাম পেরু। যদিও সরকারিভাবে দেশটির নাম রিপাবলিক অব পেরু। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে উনিশতম। আয়তন ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ২১৬ বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালের গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৪৩ জন। জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ২৩ জন। পেরু দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে আছে ইকুয়েডর আর কলম্বিয়া, পূর্বে ব্রাজিল এবং দক্ষিণ-পূর্বে বলিভিয়া, দক্ষিণে চিলি ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। পেরুর রাজধানীর নাম লিমা।

প্রাচীনকাল থেকেই পেরু বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ধাত্রীভূমি। ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়ে ওঠা নর্তে চিকো সভ্যতা থেকে পঞ্চদশ শতকে গড়ে ওঠা ইনকা সভ্যতার মধ্যবর্তী সময়ে আরও অসংখ্য সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে। ১৪৯১ সালে কলম্বাস যখন আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন, সে-সময় ইনকা সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য। চীনের মিঙ, রাশিয়ার ক্যাথারিন দ্য গ্রেট বা তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যও এত বৃহৎ ছিল না। এরপর এই অঞ্চল দখল করে স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা। তাদের এই দেশগুলির লুণ্ঠন, হত্যা, অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে, চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। স্প্যানিশ দখলদাররা বিজিত রেড-ইন্ডিয়ান মানুষদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত বা তাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিত। এসব বর্ণনায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্প্যানিশ সাম্রাজ্য দ্বারা দলিত-মথিত হয়ে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা তাদের অতীত যুগের ভাষা ভুলে গেছে। এখন গোটা মহাদেশটাই স্প্যানিশে কথা বলে। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের নিগড়ে থেকে আমরা ভারতীয়রা কিন্তু নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি ভুলিনি।

১৮২১ সালে পেরু স্প্যানিশ দখলদারদের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮২১ সালে স্বাধীনতা ঘোষিত হলেও তিন বছর পর ১৮২৪-এ আয়াকুচোর যুদ্ধে জয়লাভ করে পেরু প্রকৃত স্বাধীনতা পায়। সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়ে দুজন মানুষ আজও স্মরণীয়। সাইমন বলিভার আর হোসে দে সান মার্টিন। এঁরা দুজন স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে সমগ্র লাতিন আমেরিকাকে মুক্ত করেন। আজও হাজারো সমস্যা থাকলেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে একটা মূলগত মনের ঐক্য আছে।

পেরু একটি গণতন্ত্রী প্রজাতান্ত্রিক দেশ। দেশটি ২৫-টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত। এবং এটি একটি উন্নয়নশীল দেশ। যদিও দেশটির চার ভাগের একভাগ মানুষ (২৫.৮ শতাংশ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

পণ্ডিতদের একাংশের মতে পেরু নামটি এসেছে বীরু থেকে। এটি এক শাসকের নাম ছিল। যিনি পানামার সান মিগুয়েল উপসাগরীয় অঞ্চলে থাকতেন। প্রায় ৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পেরুতে সভ্যতার সূচনা। আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে থাকা আনদিয়ান সমাজগুলো নির্ভরশীল ছিল চাষবাস ও পশুপালনের ওপর। ধানচাষ ও সেচ ব্যবস্থা এরা জানত। ৩২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোয় গড়ে ওঠে নর্তে চিকো সভ্যতা। নর্তে চিকো সভ্যতার মানুষরা মিশরীয়দের অনেক আগেই মমি তৈরি করতে শিখে গিয়েছিল। কিউপিসনিক সভ্যতা শিখরে পৌঁছেছিল ১০০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। চাভিন সভ্যতা উন্নতিলাভ করেছিল ১৫০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আরও যে-সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, সেগুলো হল পারাকাস, নানকা, ইয়াবি, চিমু, মোহিকা। মোহিকারা সেচ ব্যবস্থাকে অসম্ভব উন্নত করেছিল। এবং অনুর্বর জমিগুলোকে উর্বর করেছিল। পঞ্চদশ শতকে পেরুতে শক্তিশালী ইনকা সাম্রাজ্যের সূচনা।

ইনকা সভ্যতার নিদর্শনগুলো আজও মানুষকে হতবাক করে। ইনকাদের সাম্রাজ্যের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০০০ কিলোমিটার। যেখানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর দূরত্ব ৩০০০ কিলোমিটার। সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার জন্য ইনকারা ৪০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা বানিয়েছিল। এলাকার পর এলাকা জুড়ে পাহাড় কেটে কেটে কৃষিজমি বানিয়েছিল। সূর্যদেবতা কোরিকানচার মন্দির আজও সবাইকে মুগ্ধ করে। এই বিশাল মন্দিরের ছাদের নীচে চলে গেছে চওড়া চওড়া সোনার পাত। ইনকারা সূর্যের উপাসক ছিল। তাই সূর্যের দ্যুতিকে ফুটিয়ে তুলতে তারা সূর্যদেবতার মূর্তি তৈরি করত সোনা দিয়ে। আর চন্দ্রদেবতার মূর্তি বানাত রুপো দিয়ে। হার্জের বিখ্যাত কমিকস 'টিনটিনে' 'সূর্যদেবের বন্দী' নামক বইটিতে ইনকাদেশে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি আছে। ইনকা সভ্যতার বিস্ময় মাচু-পিচু শহর। স্প্যানিশদের কাছে পরাজয়ের পর এই মাচু-পিচু ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়। আবার বিশ শতকের গোড়ায় নতুন করে আবিষ্কৃত হয়। চারিদিকে খাড়া পাহাড়, সবুজের সমারোহ, উরুবাম্বা নদীর তীরে এই সুন্দর শহর। এর নগর পরিকল্পনা আজও তাবড় তাবড় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মুগ্ধ করে। আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সের

প্রকাশিত একটি বইয়ের নাম 'মাচু-পিচু: এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স মার্ভেল'।

পেরুর ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কোস্টা, অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্রতীরবর্তী ভূমি। এটি একটি সরু সমভূমি অঞ্চল। অনুর্বর ও শুষ্ক। মরসুমি নদীর জলে পুষ্ট। আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলকে বলে সিয়েরা। এখানে রয়েছে আলটিপ্লানো মালভূমি এবং এই অঞ্চলে রয়েছে দেশের সবচেয়ে উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ হুয়াসকারান। যার উচ্চতা ৬৭৬৮ মিটার। এবং তৃতীয় অংশটি হল আমাজন নদীর অববাহিকা জুড়ে থাকা ঘন বর্ষা-অরণ্য। যাকে বলা হয় সেলভা। পেরু আর বলিভিয়ার সীমানা বরাবর রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বেশি জলধারণক্ষমতাসম্পন্ন হ্রদ টিটিকাকা। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৮১২ মিটার ওপরে অবস্থিত। একে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম নৌবহনযোগ্য হ্রদ।

পেরুতে জলবায়ুর তারতম্য প্রচুর। উপকূলীয় অঞ্চলগুলির তাপমাত্রা স্বাভাবিক। এবং বৃষ্টিপাত স্বল্প। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোয় গ্রীষ্মকালে বর্ষার হার প্রবল। কিন্তু আন্দিজের উচ্চ অঞ্চলগুলোয় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কমতে থাকে।

পেরুর আমাজন অঞ্চল তো উচ্চ বৃষ্টিপাত আর প্রবল তাপমাত্রার জন্য অতি পরিচিত। পেরুর জীববৈচিত্র্য অতুলনীয়। ২০০৩ সালের হিসেব অনুযায়ী সমগ্র দেশটিতে ২১৪৬২ রকমের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর কথা জানা যায়। পেরুতে রয়েছে ১৮০০ প্রজাতির পাখি, ৫০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩০০ প্রজাতির সরীসৃপ। এখানে পুমা, জাগুয়ার খুব দেখা যায়। স্পেকট্যাকল বিয়ার পেরুর দ্রষ্টব্য। পেরুতে প্রচুর পরিমাণ গুয়ানো উৎপন্ন হয়। এবং এগুলি বিক্রি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

গুয়ানো সামুদ্রিক পাখি বা বাদুড়ের বিষ্ঠা। এটি খুবই ভালো সার। আঠারো-উনিশ শতকে পেরুর সমুদ্রতট ও কাছাকাছি দ্বীপ থেকে গুয়ানো এনে ইউরোপের জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মাছ পাওয়া যায়। সিবাস, ফ্লাউন্ডার, অ্যানকোভিস, টুনা, সেলফিস ইত্যাদি।

পেরুর উদ্ভিদজগৎও বৈচিত্র্যময়। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোয় দেখা যায় ক্যাকটাস। পাহাড়ি অঞ্চলে যে-উদ্ভিদগুলো জন্মায়, সেগুলি মূলত শিশিরের জলে জন্মায়। এই অঞ্চলগুলিকে বলা হয় ফগ ওয়েসিস। আন্দিজ পাহাড়ি অঞ্চলে যে-তৃণভূমি দেখা যায়, তার নাম পুনা। এ ছাড়া ইচু নামে একপ্রকার বন্যারোধক উদ্ভিদ দেখা যায়।

বিশ্বব্যাঙ্কের মতে পেরুর অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে ৩৯-তম বৃহৎ অর্থনীতি। পেরুর অর্থনীতি মূলত দাঁড়িয়ে আছে রপ্তানির ওপর। দারিদ্র্যসীমা কমছে। ২০১০ সালে এ-দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল ৩১.৩ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫.৮ শতাংশে।

আগেই বলা হয়েছে, পেরু নৃতাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ। পাঁচ শতক ধরে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্প্যানিশ বিজয়ের পর ১৬০০ সালে এখানে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যায় সংক্রামক প্লেগে। স্প্যানিশ উপনিবেশের সময় দাস হিসেবে এসেছে প্রচুর আফ্রিকান, স্বাধীনতার পর অভিবাসী হিসেবে এসেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি থেকে মানুষ। ১৮৫০ নাগাদ এসেছে চীনা ও জাপানিরা।

পেরুর সরকারি ভাষা স্প্যানিশ, কুয়েচুয়া এবং আয়মারা। ৮৪.১ শতাংশ মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে।

২০০৭ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী পেরুর ৮১.৩ শতাংশ মানুষ ক্যাথলিক, ১২.৫ শতাংশ ইভানজ্যালিক্যাল প্রোটেস্ট্যান্ট। ৩.৩ শতাংশ মানুষ ইহুদি, চার্চ অব জেসাস ক্রাইস্ট, লেটার ডে সেন্টস, জিহোভা উইটনেস এই প্রতিষ্ঠানগুলো মেনে চলে। ২.৯ শতাংশ লোক কোনো ধর্মমত মানে না।

শেষ করার আগে বলি, লাতিন আমেরিকান সাহিত্য আমাদের বার বার মুগ্ধ করেছে। এই মহাদেশেরই লেখকদের আবিষ্কার ম্যাজিক রিয়ালিজম। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, হুয়ান রালফো, আলেহো কার্পেন্তিয়র এই মহাদেশেরই মানুষ। এরকমই এক দিকপাল সাহিত্যিক হলেন পেরুর মারিয়ো ভার্গাস ইয়োসা, ২০১০ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পান।

অতনুমিথুন মণ্ডল

ভাষা

মি জো

এবার বেছে নিয়েছি এমন একটি ভাষা, যে-ভাষাটি বাংলার প্রতিবেশী হলেও, আমরা জানি না তো বটেই, বরং বরাবর তাচ্ছিল্য করে এসেছি।

মিজো ভাষা।

ভাষাটি বলেন মূলত মিজোরামের অধিবাসীরা, যাঁদের আমরা মিজো নামেই চিনি। স্থানীয়দের কাছে ভাষাটি লুসাই নামেও পরিচিত। বলা হয়, মিজোরা ষোড়শ শতকে এসেছিল বর্মার, অধুনা মায়ানমারের চীন নামের পার্বত্যপ্রদেশ থেকে। বেশ কয়েকটি ধাপে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মায়ানমারের ওই এলাকাতেও মিজোভাষীরা রয়েছেন। এ ছাড়া কিছু রয়েছেন মণিপুরে, নাগাল্যান্ডে, ত্রিপুরায়, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আর অসমে। সব মিলিয়ে প্রায় সাত লক্ষেরও বেশি মানুষ কথা বলেন মিজো ভাষায়।

মিজোরাম কথাটি এসেছে মি মানে মানুষ, জো অর্থে পাহাড় আর রাম অর্থাৎ ভূমি থেকে। অর্থ দাঁড়ায়— পার্বত্য এলাকার মানুষ।

এটি এখন মিজোরামের সরাকারি ভাষা এবং সেইসূত্রে ভারতীয় ভাষাও। ভাষাটি আসলে সিনো-টিবেটান গোত্রভুক্ত। সিনো-টিবেটান একটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী। এর অনেক শাখা রয়েছে। একেক শাখায় বেশ কয়েকটি করে ভাষা। এই ভাষাগুলোর কিছু পাওয়া যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশে, নাগাল্যান্ডে, মণিপুরে, অসমে, এমনকী সিকিমেও। অবশ্য এই ভাষাগোত্রের বেশিরভাগ শাখাই রয়েছে চীন-সহ বিস্তীর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

তেমনই একটি শাখার নাম টিবেটো-বার্মা। এই টিবেটো-বার্মা শাখা থেকেই মিজো ভাষার উৎপত্তি। এটি মূলত কুকি উপজাতির ভাষা। এই টিবেটো-বার্মা গোত্রের আরও কয়েকটি ভাষা হল: আরাকানি, বর্মি, হাজং, গারো, কার্বি, সিকিমি, লাদাখি, বোড়ো, মণিপুরি, লিম্বু, লেপচা, তিব্বতি ইত্যাদি।

মিজো ভাষা লেখা হয় রোমান লিপিতে। অষ্টাদশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতায় ভাষাটি সংগঠিত রূপ পায় ভারতে, উইলিয়াম জোন্সের চেষ্টায়।

মিশনারিদের দ্বারা পঁচিশটি রোমান হরফের সাহায্যে মিজো লেখার শুরু হলেও এখন মিজোরা ধ্বনির নিখুঁত লিপ্যন্তর করতে আরও কিছু হরফ যুক্ত করেছেন। কেননা, মিজো একটি স্বনির্ভর ভাষা। স্বর নিক্ষেপের তারতম্যের ফলে শব্দের অর্থ বেমালুম পালটে যায়।

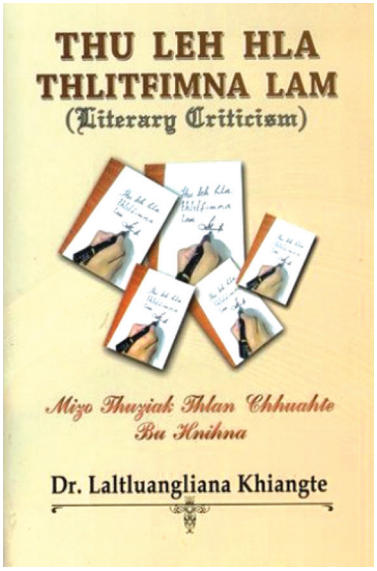

এই স্বর উঁচুনীচুর এবং দীর্ঘ আর হ্রস্বের তারতম্য এতটাই যে, 'অ' স্বরবর্ণের উচ্চারণে আট রকমের স্বর ব্যবহৃত হয় এবং মানেও পালটে যায়। খুবই শ্রুতিমধুর ভাষাটির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি এই যে, মিজো ভাষায় বিশেষ্য পদের কোনো লিঙ্গভেদ নেই।

মিজোরামের সমস্ত স্কুল-কলেজে মিজো ভাষা পড়ানো হয়। উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে রাজধানী আইজলের মিজো বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুনে চমকে যেতে পারেন অনেকে যে, চব্বিশটি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে মিজো ভাষায়, যেগুলোর মধ্যে কুড়িটি প্রকাশিত হয় আইজল থেকে। নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও হয়। রয়েছে মিজো সাহিত্য অকাদেমি। এবং ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর একটি করে বইকে অকাদেমি পুরস্কৃত করে। মিজোরামে এটি একটি সম্মানজনক পুরস্কার।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত কয়েকটি মিজো বাক্য এবং শব্দ:

Ka läwm e	ধন্যবাদ
I dam em?	কেমন আছ?
Tui	জল
Châw	খাবার
Sanghâ	মাছ
Arsâ	মুরগির মাংস
Khúa	গ্রাম, শহর
Ní	দিন/ সূর্য
Thlà	চাঁদ/ মাস
Kum	বছর/ বয়স

মনে রাখতে হবে, মিজো ভাষার একাধিক লেখককে ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছেন।

নেহা চৌধুরী

তারায় তারায়

আ র্দ্রা

আকাশে যোদ্ধারূপে কল্পিত কালপুরুষ তারামণ্ডলী প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মুগ্ধ করেছে। এই যোদ্ধা যেন ধনুকের টংকার তুলে বা মুগুর হাতে শত্রুর দিকে মারমুখী এগিয়ে গিয়ে আকাশকে পরিণত করেছে রণক্ষেত্রে। প্রাচীন সভ্যতার যুদ্ধবাজ জাতিগুলোর মধ্যেও এই তারামণ্ডলীর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে, কালপুরুষমণ্ডলটি বৈচিত্র্যময়। বহু রকমের তারা, উজ্জ্বল নীহারিকা, কৃষ্ণ নীহারিকা সবই এর মধ্যে আছে। যে উজ্জ্বল কমলা লাল তারাটি আমরা কালপুরুষের ডান কাঁধে দেখতে পাই, সেটির নাম আলফা ওরিয়োনিস বা আর্দ্রা বা বিটলগুস। আর্দ্রা রাত্রির আকাশের নবম উজ্জ্বলতম তারা এবং কালপুরুষমণ্ডলীর দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। কিন্তু বাস্তবে আর্দ্রার উজ্জ্বলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যদিও এই পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারি ছ-বছর ছাড়া ছাড়া। আর্দ্রার আপাত প্রভার মান ০.০ থেকে ১.৩-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আর্দ্রা M-1-2 প্রকৃতির লাল অতি দানব প্রকৃতির তারা। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ গুণ। আর্দ্রার ভর সূর্যের ১০ থেকে ২০ গুণ। এর ভর মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হয়। দূরত্ব আমাদের সূর্য থেকে ৬৪০ আলোকবর্ষ। আমাদের সূর্যের বয়স যেখানে প্রায় ৫৪০ কোটি বছর এবং এখনও সূর্যের যৌবনকাল। আরও প্রায় ৫০০ কোটি বছর তার আয়ু। সে তুলনায় আর্দ্রার বয়স এখন মাত্র এক কোটি বছর। কিন্তু এখনই আর্দ্রা মৃত্যুর মুখে চলে এসেছে।

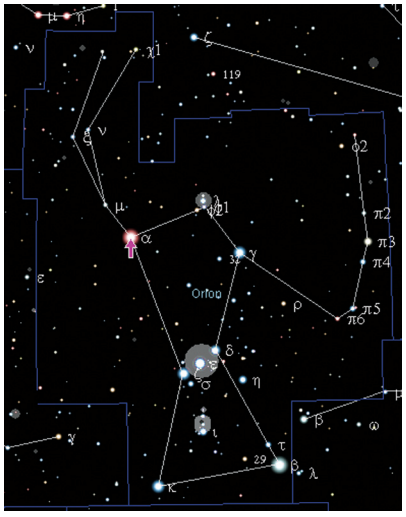

আসলে যে-তারা আকারে যত বড়ো হয় তত দ্রুত সে নিজের জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে। তারাদের মধ্যে যে-প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ তাপ ও আলো তৈরি হয় তাকে বলে নিউক্লিয়ার ফিউশন বা নিউক্লিয়ো সংযোজন। চারটি হালকা হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর জুড়ে গিয়ে ভারী হিলিয়ামে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এরকমভাবেই হিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে আরও ভারীতম মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। যেমন কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি। এরকমভাবেই তারার কেন্দ্রে একসময় যদি লোহা তৈরি হয় তাহলে তারাটি ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়বে। একে বলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ।

আর্দ্রাকে বলা হয় রানঅ্যাওয়ে স্টার অর্থাৎ এই তারা মহাশূন্যের আন্তর্নাক্ষত্রিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। এই গতির পরিমাণ সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার। আর্দ্রা তার মধ্যেকার ভরকে মাঝে মাঝে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে সুপারনোভা হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চায়, তাই এর ভর হ্রাস পায়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কালের নিয়মে আর্দ্রার সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু কবে ঘটবে বলা সম্ভব হবে না। এই সুপারনোভা বিস্ফোরণটি হলে পৃথিবীর মানুষ এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী থাকবে। দেখা যাবে রাতের

আকাশে সারাক্ষণ থাকবে পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল জ্যোতি। এবং দিনের আলোতেও সূর্যের উপস্থিতিতে এই উজ্জ্বলতাকে আলাদাভাবে চেনা যাবে।

বিটলগুস নামটি এসেছে আরবি শব্দ ইবত-আল-জায়ুজা থেকে। যার অর্থ কালপুরুষের বাহুমূল। আগেই বলেছি এই তারাটি কালপুরুষমণ্ডলীয় কল্পিত যোদ্ধাটির ডান বাহুকে সূচিত করে। আকাশে আর্দ্রাকে খুঁজে নেওয়া খুবই সহজ। এমনিই খালি চোখে একে দেখলে এর সম্পূর্ণ পৃথকরকম কমলা লাল রং চোখে পড়ে। উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসের শুরুতে একে দেখা যায় সূর্যাস্তের পর পুব আকাশে।

মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারাবিক স্টাডিজের অধ্যাপক পল কুনিৎসজের মতে বিটলগুস (Bettlegues) নামটা এসেছে আরবি শব্দ ইয়াদ-আল-জায়ুজা থেকে। যার অর্থ জায়ুজার হাত। জায়ুজা বলতে কালপুরুষ তারামণ্ডলীকে বোঝানো হত।

মধ্যযুগে ল্যাটিনে তারা সংক্রান্ত নিবন্ধগুলো আরবি থেকে অনূদিত হওয়ার সময় ইয়াদের ই-এর জায়গায় বি বসে যায় এবং নামটি হয়ে দাঁড়ায় Bait-al-Jawza বা কালপুরুষের ঘর বা Bat-al-Jawza, যার অর্থ কালপুরুষের বাহুমূল। এই নামটাই পরবর্তী সময়ে হয়ে গেছে বিটলগুস। Betelgeuse নামটির শেষ অংশ elgeuse এসেছে al-jauza থেকে, যা আরবি ভাষায় কালপুরুষমণ্ডলীকে বোঝায়। শব্দমূলগতভাবে Jauza-র অর্থ মধ্যবর্তী।

ফারসিতে আর্দ্রাকে বলা হত বসন। যার অর্থ হল বাহু। চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় আর্দ্রাকে বলা হত সেনজিউসি। জাপানে তাইরা বা হেইকে উপজাতি আর্দ্রার লাল রঙে মুগ্ধ ছিল। এবং একে বলত হেইকে বোসি। মিনামাতো গোষ্ঠীর লোকেরা আর্দ্রার সাদা রংটি পছন্দ করত। আমরা আগেই জেনেছি যে, আর্দ্রার তাপমাত্রা বদলায়। এর সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠের রংও বদলায়। জাপানি মানুষদের বিশ্বাস, মিনামাতো ও হেইকে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করত কালপুরুষমণ্ডলীর তারারা। এবং এই যুদ্ধে আর্দ্রার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তাহিতি দ্বীপের মানুষজন আর্দ্রাকে বলত আনা-বারু। একে আরও বলা হত তাউরুয়া-নুই-ও-মেরে। হাওয়াই দ্বীপে এর নাম ছিল কাউলিয়া-কোকো! মধ্য আমেরিকার লাকানডন সম্প্রদায়ের মানুষ আর্দ্রাকে বলত চাক তুলিক্স বা লাল প্রজাপতি। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে ধারণা ছিল আর্দ্রা কালপুরুষমণ্ডলীর কোনো যোদ্ধার ছিন্ন অঙ্গ। ব্রাজিলের তাওলিপাং উপজাতির মানুষের কাছে কালপুরুষ পরিচিত জিল্লিকায়াই নামে। তারা মনে করে জিল্লিকায়াইয়ের স্ত্রী রাগে জিল্লিকায়াইয়ের পা কেটে নেয়। এদের বিশ্বাস আর্দ্রার উজ্জ্বলতা ও আলোর রঙের পরিবর্তন হয় এই কাটা অঙ্গের দরুন। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্দামান আদিবাসীরা এই তারাকে ডাকেন ইয়া-জুনগিন বা পেঁচার চোখ ঝাপটানি বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাণ অনুযায়ী আর্দ্রা হল একটি সিংহ, যে শিকারির দৃষ্টিতে চোখ রেখেছে তিনটি জেব্রার ওপর। এই তিন জেব্রা হল কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিন তারা। সুমাত্রার বাটাক উপজাতির কাছে আর্দ্রার পরিচয় মোরগের লেজ হিসেবে।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র। বেদে রুদ্রর বর্ণনা রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির দেবতা হিসেবে। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সপ্তাহে সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করত। যে-সময়ে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভাবনা অর্থাৎ বছরে প্রথম মাটির আর্দ্র হওয়ার পালা। পণ্ডিতদের অভিমত, এই কারণে তারাটির নাম আর্দ্রা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আর্দ্রার একটি নাম বাহু। রাতের আকাশে তাকালে মনে হয় যথার্থ এই নাম। আর্দ্রার দিকে তাকালেই মনে হয়, টান-টান ধনুকের ছিলায় দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে উঠেছে এক বীরের বাহু।

অতনুমিথুন মণ্ডল

বইভব

ছোট রাজকুমার, আঁতোয়ান্ দ্য স্যাঁতেক্সুপেরি, অনুবাদ: ফাদার দ্যতিয়েন, লালমাটি, ৭০ টাকা

সা রা দি ন সূ র্যো দ য়, সা রা দি ন সূ র্যা স্ত

মনে করুন, আপনি একজন বৈমানিক আর আপনার উড়োজাহাজটি ফেঁসে গিয়েছে একটা মরুভূমির মাঝখানে। আপনি জানেন না কীভাবে পরিত্রাণ মিলবে সেই ছায়াহীন-জনহীন পরিস্থিতি থেকে। আপনি গালে হাত দিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছেন, এমন সময়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়াল এমন এক শিশু, যে মাঝমরুতে কোথা থেকে হেঁটে এল, তা আপনি ঠাহর করতেও পারবেন না। সে ক্ষুধার্ত নয়, তৃষ্ণার্ত নয়, তার উপরে এমনই নির্লিপ্ত ভাব তার যে, সেটাকে বরদাস্ত করাই দায় হয়ে দাঁড়ায়।

এমন এক অবস্থার কথাই লিখে গিয়েছিলেন ফরাসি লেখক আঁতোয়ান দ্য স্যাঁতেকসুপেরি তাঁর 'ল্য প্যতি প্র্যাঁস' নামের ছোটোদের উপন্যাসটিতে।

'ছোটোদের উপন্যাস' কথাটা লিখে ফেললাম বটে, কিন্তু এই বই পড়তে বসলে প্রথম পাতা থেকেই খটকা লাগে, এ-বই কি আদৌ ছোটোদের? ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসিকায় লেখক স্যাঁতেকসুপেরি প্রথম থেকেই বড়োদের আর ছোটোদের জগৎকে এমন এক বিভাজনে দেখেছেন, যার পরম্পরা পরবর্তীকালে একটা ধ্রুবপদ হয়ে দাঁড়ায় সারা বিশ্বের শিশুসাহিত্যে। এ-বই এমনই এক রহস্যময় যাত্রা যে, এর থইও মেলে না সব সময়।

মরুভূমিতে খারাপ হয়ে থাকা উড়োজাহাজ, তার বৈমানিক আর শূন্য থেকে আসা আশ্চর্য বালককে নিয়ে লিখিত এই আখ্যানে কথা ও কল্পনার সীমারেখা কখনোই স্পষ্ট নয়। স্যাঁতেকসুপেরির ফরাসি থেকে প্রত্যক্ষ বাংলা অনুবাদে সেই গদ্যমায়া যে পুরোপুরি রক্ষিত, সে-কথা ফরাসি না জানলেও অনুমান করা যায় বাংলা গদ্যের এক জাদুকর ফাদার দ্যতিয়েনের 'ছোট রাজকুমার' পড়তে বসলে।

ছোটো রাজকুমারের বাস এমন এক ছোট্ট গ্রহে, যেখানে একটু চেষ্টা করলে সারাদিন সূর্যাস্ত দেখা যায়, রাজকুমার বিষণ্ণ, তার বিষাদ যেন ছড়িয়ে রয়েছে মহাজগতের গ্রহ-তারা-শূন্যতায়। তার বিষাদকে স্পর্শ করতে পারেন সে-বৈমানিক। কারণ, তিনিও সম্ভবত বিষণ্ণ আর সেই রাজকুমারের মতোই একা। এই বিষাদের মধ্যের কোথাও একটা আনন্দের ফল্গুস্রোত রয়েছে, যা মূর্ত হয় তাঁদের আপাত-যুক্তিহীন কথোপকথনে, বৈমানিকের আঁকা কিম্ভূত ছবিতে। তার খুদে গ্রহের একঘেয়েমির মধ্যে ফুটে ওঠা এক ফুল আর তাকে ছেড়ে গ্রহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া কুমারের অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে খেলা করে এমন এক বিষাদ, যার উৎস সেই বিরহ। এই বিরহ কি মহাজাগতিক? আমরা সকলেই শরিক নই এই বেদনার? চেনা পৃথিবী আর অচেনা বিশ্বের মধ্যে কোথাও রিনরিন করে বেজে যায় এই বিষাদের সুর। কোথায় যেন ফিরে যেতে হবে? কার কাছে যেন নিতে হবে আশ্রয়? এইসব প্রশ্ন বার বার ভিড় করে সূর্যাস্তের একাকিত্বে। উত্তর মেলে না বলেই হয়তো আমাদেরও বেরিয়ে পড়তে হয় নিজের ভিতর থেকে। স্যাঁতেকসুপেরি সেই সক্কলের ভ্রমণটাকেই কি লিখেছিলেন তাঁর এই আখ্যানে?

সুকুমার রায় যাকে 'খেয়াল রস' বলতেন, এই বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আপাত-অবিশ্বাসের মধ্যেও কোথায় যে থমকে থাকে গভীরতর বিশ্বাস, আর সেই বিশ্বাসের ভিতটার নাম বোধ হয় ভালোবাসা। গোলাপ আর কুমারের মধ্যেকার ভালোবাসা, বৈমানিক আর কুমারের মধ্যেকার ভালোবাসা। একে কী নামে ডাকা যায়, তা বড়োরা জানে না। জানার কথাও নয়। তারা তো ব্যস্ত নিজেদের নিয়েই। সে-ব্যস্ততার প্রতি স্যাঁতেকসুপেরি ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে গিয়েছেন এই বইতে। কিন্তু কোথাও সেই ব্যঙ্গ কাঁটার মতো বেঁধে না। সেই ব্যঙ্গের মধ্যেও খেলা করে বিষণ্ণ কৌতুকের বর্ণালি।

কিন্তু কৌতুক কোথাও শেষ হয়। কুমারকে একদিন চলে যেতে হয়। সে আর-এক বিচ্ছেদ। শেষ পর্যন্ত আখ্যান গিয়ে থামে সুন্দর আর বিষণ্ণতার এক তারাভরা রাতে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, লেখক স্যাঁতেকসুপেরিকেও এভাবেই একদিন চলে যেতে হয়েছিল একা, নিজের ছোট্ট বিমানে সওয়ার হয়ে। একবুক অভিমান আর ভালোবাসা নিয়ে তারাভরা রাতের আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেই দিন। না, স্যাঁতেকসুপেরি আর ফেরেননি। বৈমানিক স্যাঁতেকসুপেরি কি সেই দিন দেখা পেয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ছোটো কুমারের? কুমার কি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তার সেই একরত্তি গ্রহে, যেখানে সারাদিন সূর্যাস্ত দেখে আর গোলাপ নামে এক ভালোবাসার পরিচর্যা করে কেটে যাবে অনন্ত সময়? জানা নেই। ভাবতে ভালো লাগে এইসব।

স্যাঁতেকসুপেরির এই আশ্চর্য আখ্যানের যে এক আশ্চর্য বাংলা অনুবাদ রয়েছে, সেটা ভাবতেও ভালো লাগে। আর এটা ভাবতেই ভালো লাগে যে, সারাজীবন ধরে এই আখ্যান পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন ফাদার দ্যতিয়েন নামের এক রূপকথার মানুষ। রূপকথার নটে গাছটি কোনোদিন মুড়োয় না যাদের জীবনে, এ-বই তাদের মাথার বালিশের পাশটিতে থেকে যাবে চিরকাল।

নির্বাক মুখোপাধ্যায়

সবজান্তা

জা নু য়া রি ক থা

১৪ জানুয়ারি: ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনটিতে আগ্রায় জন্মেছিলেন 'আইন-ই-আকবরি' প্রণেতা আবুল ফজল। মুঘল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের পুরো নাম আবুল ফজল ইবন মোবারক। আবুল ফজল আল্লামি নামেও তিনি পরিচিত। পিতার নাম শেখ মোবারক। এই পরিবারটি সিন্ধুপ্রদেশ থেকে নাগৌর, আহমেদাবাদ হয়ে আগ্রায় বসতি স্থাপন করে। আবুল ফজল মাত্র ২৪ বছর বয়সে আকবরের রাজসভায় যোগ দেন। ক্রমে তাঁর পাণ্ডিত্ব আর মুক্তচিন্তার ঔজ্জ্বল্যে সম্রাটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তীকালে, লেখক-পরিচয়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে তাঁর দীর্ঘদিন বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রিত্ব সামলানোর গুরুদায়িত্বটি। তাঁর লেখা দু-খণ্ডে 'আকবরনামা', 'আইন-ই-আকবরি', 'রাকাত' (তাঁর লেখা চিঠিপত্রের সংকলন), 'ইনশা-ই-আবুল ফজল' বা 'মুকতুবাত-ই-আল্লামি' (সরকারি প্রতিবেদনের সংগ্রহ) বইগুলি পরে আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। সিংহাসনে বসার প্রতিবন্ধক সন্দেহে ১২ অগাস্ট ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা সেলিম তাঁকে হত্যা করান। এই কাজটি করেছিল বীর সিং বুন্দেলার নেতৃত্বে একদল দস্যু। এ জন্য আকবর আমৃত্যু ক্ষমা করেননি তাঁর পুত্রটিকে। তাঁর সমাধি রয়েছে গোয়ালিয়র জেলার ভিতেরওয়ার মহকুমায়, আন্ত্রি নামে এক অখ্যাত স্থানে।

২৫ জানুয়ারি: ১৭৫৫ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠা হয় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের, যার নাম এখন মস্কো স্টেট ইউনিভারসিটি। তৎকালীন রুশ শিক্ষামন্ত্রী এবং জ্ঞানচর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইভান ইভানোভিচ শুভালভ এবং শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলীর আবিষ্কর্তা, বিজ্ঞানী ও লেখক মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ লোমোনোসভের এক প্রস্তাবে রাশিয়ার রানি এলিজাবেথ অনুমতি দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। এখন মস্কো স্টেট ইউনিভারসিটি বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি। প্রায় চার হাজার অধ্যাপক, পনেরো হাজার সহকারী স্টাফ এবং পাঁচ হাজার গবেষক এখানে শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত। বিদেশি ছাত্রের সংখ্যা দু-হাজারেরও বেশি। মূল ভবনটি পৃথিবীর উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। দু-শো চল্লিশ মিটার উঁচু ভবনটিতে রয়েছে তেত্তিরিশ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডর আর পাঁচ হাজার ঘর। শুধু মস্কোতেই নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রয়েছে আর্মেনিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানেও।

ফে ব্রু য়া রি ক থা

১ ফেব্রুয়ারি: ১৮৮৪ সালের এই দিনটিতে 'দ্য অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি' প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, যে-বছর ভারত সিপাহি বিদ্রোহে ছিল উত্তাল। তখন এই ডিকশনারিটির নাম এমন ছিল না। ১৮৮৪ সাল থেকে 'আ নিউ ইংলিশ ডিকশনারি অন হিস্টোরিক্যাল প্রিন্সিপলস, ফাউন্ডেড মেনলি অন দি মেটিরিয়ালস কালেক্টেড বাই দি ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি' নামে ছোটো ছোটো খণ্ডে এটি প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস। ১৮৯৫ সালে 'দ্য অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি' নামটি প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখনও নামটি ইউনিভারসিটির স্বীকৃতি পায়নি। ১৯২৮ সালে দশ খণ্ডে বাঁধাই হয়ে পূর্ণ চেহারা পায়। ১৯৩৩ সালে নামটি স্বীকৃতি পায় এবং বারো খণ্ডে বাঁধাই হয়ে প্রকাশ পায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও এক খণ্ড সাপ্লিমেন্টারি ভলিউম। সেই থেকে সারা পৃথিবীতে এই অভিধানটি ইংরেজি ভাষার সর্বজনমান্য অভিধান হয়ে উঠেছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি: এই দিনটিতে, ১৮৮৪ সালে জন্ম বঙ্গাললনা সরোজিনী নায়ডুর, যিনি একাধারে ছিলেন কবি, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি অর্থাৎ ডক্টর অব সায়েন্স। ফিরে এসে হায়দরাবাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ নিজাম'স কলেজ নামে প্রসিদ্ধ। মা বরদাসুন্দরী দেবী ছিলেন উঁচু মানের সংস্কৃতিসম্পন্না। কবিতা লিখতেন বাংলায়। অঘোরনাথের পৈত্রিক বাড়ি অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগাঁওয়ে। সরোজিনীর লেখাপড়া প্রথমে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে নিজাম স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে। প্রথমে কিং'স কলেজ, লন্ডনে। পরে কেমব্রিজে। স্বামী গোবিন্দরাজালু নায়ডু ছিলেন চিকিৎসক। সাহচর্য পেয়েছেন তখনকার প্রায় সব ভারতীয় বিখ্যাত জনের। দেশ স্বাধীন হলে তিনিই হন আগ্রা এবং আউধ সংযুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল। রাজ্যপাল থাকাকালীনই ১৯৪৯-এ লক্ষ্ণৌতে মৃত্যু। তাঁর পাঁচ সন্তানের একজন পদ্মজা নায়ডু স্বাধীনতার অল্প পরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। অঘোরনাথের হায়দরাবাদের প্রশস্ত বাসভবন গোল্ডেন থ্রেশোল্ড হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন। সেটি এখন হয়েছে ইউনিভারসিটি অব হায়দরাবাদের অধীনস্থ সরোজিনী নায়ডু স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশন। ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে সেইসব সমাচার।

নতুন উদ্যোগে রহমানিয়া একাডেমি

আল-আমীনের কর্মধারা রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও বিস্তৃত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শাখাগুলির মধ্যে কয়েকটি শাখা চলে যৌথ উদ্যোগে। যৌথ উদ্যোগে চলা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হল মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের রহমানিয়া একাডেমি। ২০০৬ সাল থেকে এই ক্যাম্পাসটির পরিচালনার দায়িত্ব নেয় আল-আমীন মিশন। মিশনের উদ্যোগেই ২০০৭ সালে এখানে শুরু হয় গার্লস ক্যাম্পাস। প্রথম থেকেই রহমানিয়া একাডেমির আর্থিক দায়ভার ছিল রহমানিয়া এডুকেশন সোসাইটির ওপর এবং এর একাডেমিক ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নিয়ন্ত্রণ ছিল আল-আমীন মিশনের ওপর।

গত দশ বছর ধরে রহমানিয়া একাডেমির আশাতীত সাফল্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলস্বরূপ, এই প্রতিষ্ঠানকে আরও সুন্দর, সংহত ও মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য রহমানিয়া এডুকেশন সোসাইটি এ-বছর থেকে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক দায়িত্বভার তুলে দেয় আল-আমীন মিশনের ওপর। এবার থেকে রহমানিয়া একাডেমির আর্থিক, প্রশাসনিক এবং একাডেমিক দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল-আমীনের। এই বিষয়ে রহমানিয়া এডুকেশন সোসাইটি ও আল-আমীন মিশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১০ জানুয়ারি সোসাইটির পক্ষে সভাপতি মোস্তাক হোসেন চুক্তিপত্রটি তুলে দেন আল-আমীনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের হাতে।

এ-প্রসঙ্গে মোস্তাক হোসেন বলেন, কিছু মানুষের ভালো চিন্তা ও কাজের ফসল হল আল-আমীন মিশন-সহ রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত আবাসিক মিশনগুলি। এখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার এই ভালো কাজের সুফল সাদকা-এ-জারিয়া (মৃত্যুর পরও যার সুফল পাওয়া যায়) হিসেবে গণ্য হবে, না কি আমাদের কর্মফলে তা বিনষ্ট হবে। তিনি বলেন, মানুষের আয়ু সীমিত, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আয়ু তার চেয়ে অনেক বেশি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বেঁচে থাকে এবং আমাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে সমাজ এর সুফল থেকে বঞ্চিত না হয়, তার চেষ্টা করা উচিত।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে নবি (স.)-র নামের এই প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে। সবরকম ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং চিরকাল যাতে সেই আদর্শেই মিশন কাজ করে যেতে পারে, তার জন্য আমরা যেন সবাই দোয়া করি। তিনি আরও বলেন, সমাজে যারা সুবিধাভোগী তাদের হাত অনেক লম্বা, যারা বঞ্চিত তাদের হাত ছোটো। ফলে সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো লম্বা হাতের মতো ছোটো হাত গ্রহণ করতে পারে না। আল-আমীন মিশন সমাজের সর্বস্তরের ছোটো ও বড়ো সব হাতকে সমান করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই চিরকাল কাজ করে যেতে চায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০ জানুয়ারি এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন রহমানিয়া এডুকেশন সোসাইটির সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সদস্যদ্বয় মৌলানা ইসহাক মাদানী এবং মসিউর রহমান। মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন ও মিশনের সহকারী সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমান। সবশেষে নব উদ্যোগে এবং নব পর্যায়ে রহমানিয়া একাডেমি যাতে আরও সুন্দর ও সফলভাবে পথ চলতে পারে, তার জন্য দোয়া করেন মৌলানা মাদানী।

পাণ্ডুয়া ও নওদায় নতুন গার্লস ক্যাম্পাস

১৪ জানুয়ারি হুগলি জেলায় আল-আমীন একাডেমি, পাণ্ডুয়ার শুভ উদ্‌বোধন করেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সমাজে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার প্রতি দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে। ফলস্বরূপ আমরাও রাজ্য জুড়ে গার্লস ক্যাম্পাসের বিস্তার ঘটাচ্ছি। উপস্থিত অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমানে এই শাখায় প্রায় দেড়শো জন ছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দু-এক বছরের মধ্যেই এই শাখাটিও মিশনের অন্যান্য শাখার মতো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরিতে সক্ষম হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সহ-সভাপতি আলহাজ হাসিব আলম, মেমারি শাখাপ্রমুখ শেখ হাসিবুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষকদ্বয় সেখ হামিদুল হক ও আবদুল বারি, শিক্ষক সফিকুল হক, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বেবী বাউল দাস, সমাজসেবী হাজি মহম্মদ আলি মণ্ডল, সেখ মহম্মদ সালমান, আনিসুর রহমান এবং মিশনের পাণ্ডুয়া শাখার ইনচার্জ সেখ আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। কারি সফিকুল আলমের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

পরের দিন ১৫ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলায় আল-আমীন মিশনের নববর্ষের উপহার একটি নতুন বালিকা শাখা আল-আমীন একাডেমি, নওদা।

এই শাখার শুভ উদ্‌বোধন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ১৪০ জন ছাত্রী নিয়ে এই শাখার পথচলা শুরু। এই শুভক্ষণে এম নুরুল ইসলাম মিশনের উন্নয়ন ও বিস্তারে মুর্শিদাবাদবাসীর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং বলেন নারীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যতীত সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। তাই আমরা আমাদের সাধ্যমতো বালিকা শাখার বিস্তার ঘটাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর আবাসস্থল হয়ে উঠেছে আল-আমীন, কারণ, আমাদের প্রত্যেক শাখাতেই পড়াশোনার উচ্চ গুণমান বজায় রাখা হয়। আজকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময়

পেশাদারি পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় যাতে করে তারা সফল হতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় বিধায়ক আবু তাহের খান মন্তব্য করেন, আল-আমীনের শিক্ষা-আন্দোলন বাংলার সংখ্যালঘু সমাজের জন্য এক মহা-আশীর্বাদ। মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের জেলার অসংখ্য ছেলে-মেয়ে মিশনের সহায়তায় জীবনে সফল হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবু খায়ের, ডা. তনুজা খাতুন, সাহাদাত খান, আলমগীর হোসেন-সহ মিশনের বেলডাঙা, হরিহরপাড়া, মহম্মদপুর, ভাবতা, পলাশি ও ধুলিয়ান শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও শিক্ষকবৃন্দ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু এবং মৌলানা আকরম সেখের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন, এই শাখার ভারপ্রাপ্ত গোলাম মোর্তজা।

কোচবিহারে প্রথম

মিশনের শাখাশূন্য জেলা কোচবিহারও মিশনের মানচিত্রে জায়গা করে নিল। কোচবিহার শহরের কাছাকাছি হাওয়ারগাড়ি গ্রামে ১৯ জানুয়ারি আল-আমীন মিশন একাডেমি, কোচবিহার ক্যাম্পাসের উদ্‌বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এই শুভক্ষণে তিনি বলেন, যেহেতু গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা শহরকেন্দ্রিক, তাই শিক্ষার প্রসার

শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের জেলায় জেলায় মিশনের শাখার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হাজি মুহাম্মদ হানিফউদ্দিন মিঞার দানকৃত প্রায় ৬ বিঘা জমিতে এই ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমানে মাত্র ৪০ জন ছাত্র নিয়ে এই শাখার যাত্রা শুরু হলেও ভবিষ্যতে এটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাসে পরিণত হবে। উল্লেখ্য, গত ২০১৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৭ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে তহমিনা পারভিন। তহমিনা এই জেলার দিনহাটা থানার গোসানিমারীর বড়ো নাটাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। এই জেলার বহু ছাত্র-ছাত্রী মিশনের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে। তাদের নিজের জেলায় মিশনের শাখা হওয়ায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে জেলার শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলে খুশির হাওয়া বইছে।

আল-আমীন মানচিত্রে নদিয়ার বীরপুর

২২ জানুয়ারি নদিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা বীরপুর আল-আমীনের শিক্ষা-মানচিত্রে যুক্ত হল। এখানে আল-আমীন একাডেমি, বীরপুর শাখার উদ্‌বোধন করেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এই শুভক্ষণে তিনি বলেন, বর্তমানে ৭০ জন ছাত্র নিয়ে আমাদের এই শাখার যাত্রা শুরু হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই এটির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ইনশাআল্লাহ্ ৭০০-তে পৌঁছোবে। তিনি জানান, এই শাখার প্রতিষ্ঠায় মিশনের প্রাক্তনী মিনহাজ আলমের উদ্যোগ সর্বাধিক। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে মিশনের বেলপুকুর শাখার ছাত্র মহম্মদ আরিফ শেখ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছিল। ওই সময় বেলপুকুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সুপার ছিলেন মিনহাজ আলম।

তিনি আরও বলেন, আমরা শহর থেকে দূরে গ্রামীণ এলাকায় মিশনের শাখার বিস্তার ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কারণ, পিছিয়ে পড়া সমাজের অধিকাংশ মানুষের বাস এখনও গ্রামেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই শাখার পড়ুয়ারাও উচ্চশিক্ষা ও বিভিন্ন পেশাদারি পরীক্ষায় সফল হয়ে রাজ্য তথা দেশের সেবায় নিয়োজিত হবে। আমরা আমাদের পড়ুয়াদের উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়ে মূলধারার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য করে তুলি। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের পড়ুয়ারা তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত ও সুনাগরিক হয়ে সমাজের উন্নয়নে নিজেদের অবদান রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নজরুল স্মৃতি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আলহাজ জাকির হোসেন, বেলডাঙার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুর রাহমান, প্রাক্তন শিক্ষক আমানুল্লা, মিশনের বিভিন্ন শাখার আধিকারিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন এই শাখার মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক মিনহাজ আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েক শো অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী গ্রামবাসী-সহ সকলের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

তালদি শাখায় স্বাস্থ্য-শিবির

২৬ জানুয়ারি আল-আমীন একাডেমি, তালদি শাখায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও ওষুধ বিতরণে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ৬৮-তম প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাস্থ্য-শিবিরের যৌথ আয়োজনের শুভ সূচনা করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ড. মেহেদি কালাম। তিনি বলেন, আল-আমীন মিশনের শিক্ষা-আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর সমাজের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তিনি আরও বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য-সচেতনতাও জরুরি, কারণ, সুস্বাস্থ্যই আমাদের জন্য এক বড়ো সম্পদ। প্রতি বছর মিশনের বিভিন্ন শাখায় এই ধরনের স্বাস্থ্য-শিবিরের আয়োজন করা হয়। মিশনের সাধারণ সম্পাদক জানান, আল-আমীন মিশন শিক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য-পরিষেবায়ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর।

শিবিরে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করেন ডা. তনবিদুর রহমান, ডা. সামিম রেজা, ডা. মিজানুর হক, ডা. নার্গিস মোল্লা, ডা. বিলকিস বেগম প্রমুখ চিকিৎসক, যাঁরা সকলেই মিশনের প্রাক্তনী। দিনভর চলা এই শিবিরে নারীপুরুষ নির্বিশেষে ক্যাম্পাস সন্নিহিত প্রায় ৪০০ জন এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন। উল্লেখ্য, উইথ ইউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশেষ সহযোগিতায় স্বাস্থ্য-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর অফিসার শেখ নজরুল ইসলাম, ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার বাসার শেখ, মিশনের সূর্যপুর ও তালদি শাখার ভারপ্রাপ্ত সুপার যথাক্রমে সেখ রাজীব হাসান ও ইয়ার মহম্মদ লস্কর প্রমুখ।

শীতের আমেজে বাংলা নানা উৎসবে মেতে ওঠে। আল-আমীন মিশনও সারা বছরের লেখাপড়া থেকে ক্ষণিকের ছুটি নিয়ে গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি মেতে

আল-আমীন উৎসব ২০১৭

উঠেছিল আল-আমীন উৎসবে। মিশনের মূল শাখা খলতপুরে দুই পড়ুয়ার পর্যায়ক্রমে পবিত্র কোরআন পাঠ ও অনুবাদের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, এই মিশন শুরুর পেছনে তিনি একা নন, তাঁর সহকর্মীদেরও অবদান বিশাল। যাঁরা পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন তিনি। তাঁর আহ্বান, সমাজের উন্নয়নে সচেতন সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রায় সব জেলায় গড়ে ওঠা মিশনের শাখায় ১২,৭১০ জন পড়ুয়া পড়াশোনা করে এবং মিশনের প্রায় ১২ হাজার জন প্রাক্তনী দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শিক্ষক-পড়ুয়া মিলে মিশন আজ ২৫ হাজারের পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যেকটি সন্তানকে আমরা এমনভাবে শিক্ষিত করতে চাই, যাতে তারা সুনাগরিক হিসেবে সমাজের সঙ্গে দেশবাসীর জীবনকেও আলোকিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। অনুষ্ঠানের সম্মাননীয় অতিথি বোর্ড অব ওয়াকফ্‌সের চেয়ারম্যান জাস্টিস মহম্মদ আবদুল গণি বলেন, শিক্ষা ও উন্নয়নের প্রতিফলন আজকের মিশন। পড়ুয়াদের প্রতি তাঁর আহ্বান, কেবল নিজের উন্নয়ন নয়, দেশ ও মানবতার উন্নয়নেও তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। দৈনিক 'কলম' পত্রিকার সম্পাদক ও সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান বলেন, আল-আমীন বাংলায় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা-সহ সার্বিক অগ্রগতির প্রতীক। এটি বাংলা-সহ সারা ভারতের মডেল। সমসাময়িক বিশ্বে মুসলমানরা যেভাবে মর্যাদার অভাবে ভুগছে, তার উল্লেখ করে তিনি মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে এই ভুল ধারণা পরিবর্তনের। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান ও সাংসদ সুলতান আহমেদ বলেন, মিশনের দৌলতে জয়েন্টে ভালো র‍্যাঙ্ক করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি শেখ মহম্মদ ওয়ায়েজুল হক বলেন, মিশন থেকে প্রকৃত মানুষ ও নাগরিক তৈরি হচ্ছে, এটা খুবই বড়ো কথা। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা বলেন, 'আমি সুখে-দুঃখে সবসময়ই আল-আমীনের পাশে আছি এবং থাকবও। কারণ, এই জমি আমার কর্মভূমি, জন্মভূমি।' উল্লেখ্য, তাঁর কন্যা সুদেষ্ণা পাঁজা আল-আমীন মিশনেরই ছাত্রী। সবাই মুগ্ধ হয়ে যায় মেয়েদের দুর্দশা সম্পর্কিত এক কবিতা সুদেষ্ণা আবৃত্তি করে শোনালে।

দ্বিতীয় দিনের সূচনায় এম নুরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে ঘোষণা করেন, পর্যায়ক্রমে মিশনের বড়ো বড়ো শাখায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সেন্টার খোলা হবে। এইসব সেন্টারে খুবই কম মূল্যে এলাকাবাসী উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরামর্শ পাবেন। উল্লেখ্য, সকালে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ১১১ জন রক্তদান করেন। এরই পাশাপাশি মিশনের প্রাক্তনী বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বাস্থ্য-শিবিরে প্রায় কয়েক শো গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। পরে মিশনের পড়ুয়া ও মিশনের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে অমলিন বন্ধন নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট এম আবদুল হাসেম। দ্বিতীয় দিনের প্রধান অতিথি জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ইসলামে জাগতিক শিক্ষার্জনও জরুরি এবং এ-কাজে আল-আমীন মিশনের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। শুধু নিজে আলোকিত হলে হবে না, সমাজের অনালোকিতদের অন্ধকার থেকে টেনে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে বলে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, নানা পেশার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও আসতে হবে এবং এর মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ইনতাজ আলি শাহ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে বলেন, নিজের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া তক জাগ্রতভাবে পড়াশোনার ধারা বজায় রাখতে হবে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-অধিকর্তা বাসুদেব ঘোষ মিশনের এই কর্মযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামকে 'শিক্ষকের শিক্ষক' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তীর্থস্থানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে মানুষের আলোকায়ন ঘটে। তিনি বিবেকানন্দের বাণী 'শিক্ষিত মায়ের সন্তান কখনো নিরক্ষর হয় না' উল্লেখ করে নারী-শিক্ষায় মিশনের উদ্যোগকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেন। সমাজ, রাজ্য তথা দেশকে নিরন্তর আলোকিত করছে, রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজে শিক্ষা-আন্দোলনের পথিকৃৎ আল-আমীন মিশনের কথা বলেন পুরশুড়ার বিধায়ক ডা. এম নুরুজ্জামান। তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা-বিকাশের ইতিহাসে আল-আমীন মিশন ও এম নুরুল ইসলামের নাম উজ্জ্বলভাবেই থাকবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী একরামুল বারী মিশনের মেধাবীদের আইনের শিক্ষা গ্রহণে গুরুত্বারোপ করেন। মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভারসিটির অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মালয়েশিয়ার উদাহরণ দিয়ে বলেন, একটি বহু জাতি-ধর্মের দেশে সংখ্যালঘুদের সফল হতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর মতে, রাজ্যে সংখ্যালঘুদের মাঝে শিক্ষার প্রসারে আল-আমীন মিশন অবশ্যই পথিকৃৎ। কারণ, মিশনকে দেখেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়

বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। নদিয়ার ভূমিপুত্র রফিকুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বড়ো স্বপ্ন দেখার পরামর্শ দেন। এ-দিনের সভাপতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খান তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীদের মিশনের উন্নয়নে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, শিক্ষকের একটাই জাত ও ধর্ম এবং সেটি হল তাঁরা সবাই কেবলই শিক্ষক। উভয় দিনই মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কৃতীদের সংবর্ধিত ও পুরস্কৃত করা হয়। ২০০১ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের প্রাক্তনীদের তরফে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির জন্য ৬০ হাজার টাকা এবং প্রাক্তনী ডা. মহম্মদ আলি মিশনের পুয়োর ফান্ডে ৫০ হাজার টাকা দেন। আরেক প্রাক্তনী বিশিষ্ট শিল্পপতি মোরশেদ মোল্লার তরফে একটি অ্যাম্বুলেন্স মিশনকে উপহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রত্যেক বছর মোরশেদ মোল্লা একটি অ্যাম্বুলেন্সের চাবি আল-আমীন উৎসব মঞ্চে মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। নির্মীয়মাণ আল-আমীন জামে মসজিদের জন্য খলতপুরের ছাত্ররা দেড় লাখ টাকা তুলে দেয় সাধারণ সম্পাদকের হাতে। দু-দিনের এই উৎসবের সন্ধ্যায় পড়ুয়াদের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকগণ মুগ্ধ হন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাটনার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. আহমেদ আব্দুল হাই, উদয়নারায়ণপুরের বিডিও দেবাশিস চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, জেলা পরিষদ সদস্যা সুলেখা পাঁজা, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো ও দূরদর্শনের ডেপুটি ডিরেক্টর সেখ নজরুল ইসলাম, কলকাতার ডিটেকটিভ বিভাগের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ মাকসুদ রহমান সরদার, পাটনার বিশিষ্ট সমাজসেবী আফজাল হোসেন প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী।

মুর্শিদাবাদের মরিচায় বালক শাখা

মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার মরিচা গ্রামের তরুণ সমাজসেবী আসরাফুজ্জামান ও তাঁর ভাই হাবিবুর রহমান উভয়েরই বহুদিনের ইচ্ছা তাঁদের এলাকায় আল-আমীনের শাখা স্থাপন করানো। গত ১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের স্বপ্ন সফলের দিন। তাঁদের দেওয়া তিন বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা আল-আমীন মিশন একাডেমি, মরিচা শাখার শুভ সূচনা করেন মিশনের কর্ণধার এম নুরুল ইসলাম। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৬০ জন ছাত্র এ-বছর এই শাখায় ভর্তি হয়েছে। উদ্‌বোধনী ভাষণে এম নুরুল ইসলাম বলেন, এই শাখাটি মিশনের ৬৩-তম তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় মিশনের নবম শাখা। এই জেলার সঙ্গে মিশনের গাঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিশনের প্রায় ১৩ হাজার পড়ুয়ার মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ এই জেলার। এ-বছর মেডিকেলে ভর্তি হওয়া মিশনের প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে ১৭০ জনই মুর্শিদাবাদের। ২০০৭ সালে মাধ্যমিকে প্রথম মিশনের ছাত্র মহম্মদ আরিফ শেখও এই জেলার। মিশনের উন্নয়ন ও বিস্তারে এই জেলার পতাকা গ্রুপ-সহ অন্যান্যদের অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন, 'সব দিক দিয়ে একেবারে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ এলাকায় আমরা শিক্ষার মশাল হাতে ছুটে চলেছি। তাই আমাদের অধিকাংশ ক্যাম্পাসই গ্রামীণ এলাকায়। কারণ, আমরা মনে করি, শিক্ষার সুযোগহীনদের কাছেই শিক্ষার আলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।' রানিনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আসরাফুজ্জামান বলেন, 'পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চল শুধু শিক্ষা নয়, চাকরিবাকরি-সহ আর্থিক দিক দিয়েও একেবারে পেছনের সারিতে। আমরা তাই চেয়েছিলাম এলাকায় আল-আমীনের একটি শাখা। আজ আমাদের খোয়াব পূরণ হওয়ায় এলাকায় বইছে খুশির বন্যা।' পড়ুয়া, অভিভাবক, গ্রামবাসী, শিক্ষানুরাগী-সহ বহু বিশিষ্টজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাবনান শাখায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আল-আমীন একাডেমি, বাবনান শাখা হুগলি জেলার পোলবা-দাদপুর ব্লকের ২ নম্বর জাতীয় সড়কের একেবারে পাশে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবাসিক এই শাখায় বালক ও বালিকা দুটি বিভাগই বর্তমান। ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি দুটি বিভাগে সাংস্কৃতিক ও নবীনবরণের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বালক বিভাগের অনুষ্ঠান। নাত-এ-রাসুল, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, কুইজ, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়। এই শুভক্ষণে তাদের দেয়াল পত্রিকা 'সংকল্প'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি বালিকা বিভাগের অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এই মহল্লার দাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, 'রাজ্যের শিক্ষাবিমুখ অঞ্চলের শিক্ষানুরাগীদের সহায়তায় আল-আমীন মিশনের শিক্ষা-অভিযান জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় এই দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার্জনও করছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত যুবাদের শিক্ষকতার সুযোগের পাশাপাশি অন্যান্যদেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে।' তিনি জোর দিয়েই বলেন, মিশনে দিন দিন পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার উৎকর্ষ নিয়ে কোনোভাবেই আপোষ করা হয় না। পড়াশোনার সঙ্গে নিয়মিত সংস্কৃতির চর্চা নিয়ে তিনি উপস্থিত আধিকারিকদের সচেতন করেন। বাবনান ক্যাম্পাস নিয়ে তিনি বলেন, মিশনের মূল শাখা খলতপুরের সাব-সেন্টার হিসেবে এই শাখাটি গড়ে উঠছে।

দু-দিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি, নাত-এ-রাসুল, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, কুইজ, নাটক ইত্যাদি উপস্থিত সবারই মন ভরিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের লেখা ও চিত্রে শোভিত দেয়াল পত্রিকা 'সংকল্প'র প্রথম সংখ্যা বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ গোলাম মোর্তজা, সদস্য আলহাজ মীর আফজল, আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, সৈয়দ গোলাম মওলা, নাসিরুল হক প্রমুখ। এ ছাড়াও মিশনের মূল শাখা খলতপুর ও অন্যান্য শাখার আধিকারিক শেখ হাসিবুল আলম, মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস, মিনহাজ আলম, খন্দকার মহিউল হক, শেখ আরিফুল ইসলাম, মাহবুব রহমান প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, আয়োজন ও সঞ্চালনায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ-সহ ছিলেন এই শাখার প্রধান বসিরউদ্দিন খান।

উস্তি শাখায় কৃতী সংবর্ধনা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার আল-আমীন একাডেমি, উস্তি শাখায় কৃতী সংবর্ধনা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান ৩ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়। পবিত্র কোরআন

তেলাওয়াতের পর স্বাগত ভাষণে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম মিশনে মেধাচর্চার নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আমরা যাঁরা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও আর্থিকভাবে অগ্রসর, তাঁদেরই দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের টেনে তোলা। প্রথমেই তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ, শিক্ষার আলোতেই আমাদের সহ-নাগরিকরাও অগ্রগতির পথে চলতে শুরু করবে।'

মিশনের সাফল্য রাজ্য ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ার আশা প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আব্দুর রাউফ। তিনি বলেন, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই এটা বাস্তব। কিন্তু নিয়ম মেনে পদ্ধতিগতভাবে এই পরিশ্রম হওয়া চাই। এবং তখনই আসবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। উস্তি থানার ওসি আবু হাসান আল-আমীনের শিক্ষা-প্রসারের উদ্যোগকে সংখ্যালঘু সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি নুরুল আনোয়ার, স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন, সমাজসেবী আব্দুর রফিক মোল্লা-সহ অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও গ্রামবাসীগণ।

বারুইপুরে ডব্লিউবিসিএস আবাসিক কোচিঙের সূচনা

আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর ক্যাম্পাস ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি মুখরিত ছিল কৃতী সংবর্ধনা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডব্লিউবিসিএস আবাসিক কোচিঙের শুভ সূচনায়। স্বাগত ভাষণে সূর্যপুর মুহাম্মদ আলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মহিউদ্দিন সরকার পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও তাঁদের উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, মিশন কোনো স্কুল বা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি পরিবার। এবং দুর্বল শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই এই পরিবারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'একজন মালী যেভাবে তাঁর বাগানের ফুলের পরিচর্যা করেন, আমরাও এই জীবন্ত ফুলগুলির পরিচর্যা করে থাকি। আমরা যদি সমাজের অসহায় মানুষদের কাছে টেনে নিই, তবেই আমাদের ভালো থাকার সার্থকতা।' অনুষ্ঠানের

বিশেষ অতিথি সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান এই সোসাইটির তরফে স্কুলের পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। তিনি মিশনের অভাবনীয় সফলতারও প্রশংসা করেন। পরের দিন ৫ ফেব্রুয়ারি রিমোটের মাধ্যমে আল-আমীন মিশন একাডেমি, বারুইপুর ক্যাম্পাসের শুভ উদ্‌বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সূচনার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, পড়ুয়ারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর বা ডব্লিউবিসিএস অফিসার, যাই হোক-না-কেন, তাদের কিন্তু অবশ্যই মানবিক ও সংবেদনশীল হতে হবে। তাদের হতে হবে সমাজের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ। নারীশিক্ষার প্রতি সমান নজর দেওয়া এই মিশন নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আল-আমীন মিশন ছাত্র তৈরির কারিগর।' তিনি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ শান্তি ও সুখের হোক বলে আশীর্বাদ করেন। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে এই আবাসিক শাখায় ১০০ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রীকে ডব্লিউবিসিএসের আবাসিক কোচিং দেওয়া হবে।

ইতোমধ্যেই গত কয়েক বছর ধরে মিশনের কোচিঙে সফল ৫৫ জন ডব্লিউবিসিএস অফিসার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত। গতবছর ৪২ জন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির সরদার বলেন, সংখ্যালঘু সমাজের সার্বিক উন্নয়নে আল-আমীন মিশন অতুলনীয় অবদান রেখেছে। বাংলার মুসলমান সমাজের সাফল্যকে রাজ্য ও দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছোবার কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান। তাঁর হাত দিয়েই এই শাখার দেয়াল পত্রিকা 'কারুবাকী'র উদ্‌বোধন করা হয়। দু-দিনের এই অনুষ্ঠানের সহ-আয়োজক ছিল সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সূর্যপুর মুহাম্মদ আলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আফসার আলি নস্কর, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ইউনুশ আলি সরদার, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহেদি কালাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী আমিনউদ্দিন সিদ্দিকি, আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এ রশিদ, মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন ও রূপায়ণে ছিলেন সূর্যপুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সেখ রাজীব হাসান।

ভোপালে সম্মাননীয় অতিথি এম নুরুল ইসলাম

রাজ্য ছাড়িয়ে অসম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে মিশন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোপাল শহরের রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে মুসলিম এডুকেশন অ্যান্ড কেরিয়ার প্রোমোশন সোসাইটি (MECAPS)-র বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত ও পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এম নুরুল ইসলামকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানানোর আগে ঘোষণা করেন, 'আমাদের রাজ্যে মুসলমানদের শিক্ষার বর্তমান যে-অবস্থা, তিরিশ বছর আগে পশ্চিমবাংলার মুসলমানদেরও অনেকটা সেরকমই পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু আল-আমীন মিশনের শিক্ষা-উদ্যোগে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চশিক্ষায় এখন অবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। যার নেতৃত্বে আল-আমীন এই বিপ্লব ঘটিয়েছে, তিনি এখন আপনাদের সামনে।' ঘোষণার পর-পরই গোটা প্রেক্ষাগৃহ করতালিমুখর হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এম নুরুল ইসলাম আল-আমীনের গড়ে ওঠার কাহিনি তুলে ধরেন। তিনি মিশনের সাফল্যের রহস্য প্রসঙ্গে কৌতুকস্বরে বলেন, ছোটো পকেটমার দু-এক বছর জেল খেটে অনেক সময় বড়ো তস্কর হয়ে যায়। সেরকমই আমাদের হস্টেলগুলোও এক রকমের জেলখানা। এই হস্টেলে অনেক কম মেধার পড়ুয়া দু-তিন বছর কাটিয়ে উচ্চ মেধাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, দেশের যেকোনো জায়গায় শিক্ষা প্রসারে আল-আমীন নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে আগ্রহী। সময়, সুযোগ ও

সহযোগিতা পেলে মিশনের শিক্ষা-ক্যারাভান ইনশাআল্লাহ্ ভোপালেও পৌঁছে যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজের ভূতপূর্ব চেয়ারপার্সন ওজাহাত হাবিবুল্লাহ (আইএএস, অবসরপ্রাপ্ত), মধ্যপ্রদেশ সরকারের কমার্সিয়াল ট্যাক্স, কালচার অ্যান্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্টের প্রধান সচিব মনোজ শ্রীবাস্তব (আইএএস), বিশিষ্ট পণ্ডিত মৌলভি মোহাম্মদ উমর, সোসাইটির সভাপতি সাগীর বাইদার, সম্পাদক ডা. জাফর হাসান, মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষী মোহাম্মদ নুরুল হোদা প্রমুখ।

আল-আমীনের হেলথ কেয়ার ইউনিট

জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত আল-আমীন উৎসবে আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এক মাস পরেই গত ৩ মার্চ মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে আল-আমীন মিশনের হেলথ কেয়ার ইউনিটের শুভ সূচনা করেন উদয়নারায়ণপুরের বিডিও দেবাশিস চৌধুরী। শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে মানবসেবার এই মহান উদ্যোগকে সবারই জন্য অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মিশনের কর্ণধার এম নুরুল ইসলাম স্বাগত ভাষণে বলেন, 'আমাদের প্রায় সব শাখাই গ্রামীণ এলাকায় হওয়ায়, অভিজ্ঞতায় দেখেছি স্বাস্থ্য সচেতনতা

ও পরামর্শের অভাব খুবই প্রকট। সেই আত্মিক প্রেরণায় আমরা আমাদের প্রাক্তনী পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে বিভিন্ন শাখায় স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, এইসব কেন্দ্রে এলাকার মানুষজন নামমাত্র মূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সঠিক পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হবেন। তিনি আরও জানান, 'মেডিকেল কলেজে পাঠরত ও উত্তীর্ণ মিলিয়ে আমাদের মিশনের প্রায় দু-হাজার জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে অনেকেই এই উদ্যোগে সামিল হতে আগ্রহী।' স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি জানান, কলকাতার কাছাকাছি শহরতলিতে আল-আমীন মেডিকেল রিসার্চ ইনসটিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যেই এই সেন্টারে ডা. আনারুল হক (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ), ডা. হিবজুল আলি খান (অর্থোপেডিক সার্জন), ডা. এনায়েৎ আলি (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ) প্রমুখ চিকিৎসকদের পরিষেবা পাওয়া গেলেও, ভবিষ্যতে এই তালিকায় আরও অনেকেই যুক্ত হবেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায় মিশনের স্বাস্থ্যভাবনাকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে বলেন, মিশনের সেবামূলক কাজকর্ম সকলেরই জন্য প্রেরণাস্বরূপ।

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মহাদেব সাঁতরা, মিশনের সুপারভাইজার ও সুপারিনটেনডেন্ট যথাক্রমে সেখ মারুফ আজম ও এম আবদুল হাসেম প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনেই হেলথ কেয়ার ইউনিটে মিশন সন্নিহিত গ্রামবাসীগণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রী

সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং জেইই (মেইন) ২০১৭ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল মিশনের। ফল গত ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। মিশনের ৭-টি ক্যাম্পাসের মোট

মহ. তুহিন রানা।

সাদরুল আলম।

রাহমাতুল্লাহ্।

এজাজ হোসেন।

৮০ জনের মধ্যে জেনারেল ক্যাটাগরিতে ৩৫ জন এবং ওবিসি ক্যাটাগরিতে ১৬ জন অর্থাৎ মোট ৫১ জন সফলতা পেয়েছে। উল্লেখ্য, আইআইটি-সহ দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণায়ক এই পরীক্ষার সফল পড়ুয়ারা দেশের ১৫-টি আইআইটিতে ভর্তির জন্য আগামী ২১ মে অনুষ্ঠিতব্য জেইই (অ্যাডভান্স) পরীক্ষায় বসারও যোগ্যতা অর্জন করল।

মিশনের পড়ুয়াদের এই সাফল্যে খুশি সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম । তিনি বলেন, রাজ্যের খলতপুর, নয়াবাজ, পাঁচুড়, উলুবেড়িয়া, বর্ধমান ও সূর্যপুর ছাড়াও বিহারের পাটনা শাখা থেকে দু-জন ছাত্রী আজরা নাজির ও হেরা ফাতেমা সফল হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির এইসব পড়ুয়ারা মিশনের সার্বিক সহায়তা পেয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেও সফল হচ্ছে। মিশন থেকে এই পরীক্ষায় প্রথম তিন জন র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র হল যথাক্রমে খলতপুর শাখার মহম্মদ তুহিন রানা, বর্ধমান শাখার সাদরুল আলম মোল্লা ও নয়াবাজ শাখার রাহমাতুল্লাহ্। পাটনা শাখার আজরা নাজির মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বরূপনগরের সামান্য কৃষক পরিবারের সন্তান এজাজ হোসেন সরদার, হুগলি জেলার পূরণ গ্রামের দিনমজুর সেখ আব্দুল রাহিলের পুত্র সেখ মনসুর হাবিবুল্লা, নদিয়ার হরিণঘাটার শ্রমিক পরিবারের সন্তান সাবির মণ্ডল, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের মণ্ডলপাড়া গ্রামের মুদি দোকানি এনামুল শেখের সন্তান মিনারুল ইসলাম প্রমুখ সফলদের পরিবারে আজ খুশির হাওয়া। পড়ুয়া ও পরিবার উভয়েই মিশনের সার্বিক সহায়তার কথা কিন্তু এই আনন্দের মুহূর্তেও ভোলেননি।

প্রয়াত উপাচার্য সৈয়দ সামসুল আলম

গত ২৪ মার্চ সকাল সাড়ে ন-টা নাগাদ সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ড. সৈয়দ সামসুল আলম। স্ত্রী, পুত্র অধ্যাপক নাসিমুল আলম ও এক বিবাহিতা কন্যা রেখে গেলেন ড. আলম। তাঁর পৈত্রিক নিবাস হুগলির আরামবাগের অধীন গোঘাট থানার মদিনা গ্রামে। পরের দিন জোহর বাদ জানাজার নামাজ ও দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পড়ুয়া ছাড়াও বহু বিশিষ্ট জন এই শেষকৃত্যে অংশ নেন। মিশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ছাড়াও ননীগোপাল চৌধুরী, আলমগীর বিশ্বাস ও শেখ হাফিজুর রহমান প্রমুখ। অধ্যাপক আলমের সঙ্গে মিশনের সম্পর্ক উপাচার্য হওয়ার অনেক আগে থেকেই। তিনি মিশনের শিক্ষা-অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-আমীন মিশনের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এ ছাড়াও ছিলেন অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য। তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত এম নুরুল ইসলাম তাঁর শোকবিহ্বল পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আল-আমীনের শিক্ষা-আন্দোলনের এক বড়ো সহযোগী অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন তিনি। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের সমাজ ও মিশনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ড. আলম খড়্গপুর আইআইটির প্রাক্তনী ও তাঁর শিক্ষকজীবন শুরু হয় ওই প্রতিষ্ঠানেরই গণিত বিভাগে। ২০০৮-এ তিনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হন এবং ২০১৩ সালে অবসর নেন। তাঁর ৩৫ বছরের অধ্যাপনা কালে তিনি ৭৫-টির বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। পিছিয়ে পড়া সমাজে উচ্চশিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরব ও মুসলমান মনীষীর ঐতিহ্য ও অবদান নিয়ে তিনি বহু অমূল্য নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই হল: 'Inventions and Discoveries in Islamic Civilization' ও 'ইসলামি সভ্যতায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার'। এ ছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'A Dictionary of common words of the Holy Quraan'।

অভিনেত্রী গীতা সেনের প্রয়াণে আমরা শোকাহত

১৬ জানুয়ারি ২০১৭ নাটক ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী গীতা সেনের জীবনাবসান ঘটে। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রপরিচালক মৃণাল সেনের সহধর্মিণী গীতা সেন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। পরদিন ১৭ জানুয়ারি কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সোম এবং হাসি সোম হলেন তাঁর বাবা মা। তাঁরা থাকতেন ভদ্রকালী উত্তরপাড়ায়। ১৯৫৩ সালে মৃণাল সেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক ও 'একদিন প্রতিদিন', 'কোরাস', 'খারিজ', 'খণ্ডহর' প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করে। ২৩ জানুয়ারি গোর্কি সদনে প্রয়াত অভিনেত্রীর স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানান অপর্ণা সেন, মমতাশঙ্কর, অঞ্জন দত্ত, শ্রীলা মজুমদার, কৌশিক সেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলাদিত্য সেন প্রমুখ। মৃণাল সেন ও গীতা সেনের পুত্র কুণাল সেন মায়ের স্মৃতিচারণা করেন। এই স্মরণসভায় মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম-সহ শেখ হাফিজুর রহমান, দিলদার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এম নুরুল ইসলাম কুণাল সেনের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আল-আমীন পরিবার আপনার মায়ের প্রয়াণে গভীর শোকাহত। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ মৃণাল সেনের শারীরিক খোঁজখবরও নেন। মিশনের সঙ্গে তাঁর বাবার দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার কাহিনি তাঁকে শোনান। তিনি কুণাল সেনকে মিশনে আসার আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, সাংসদ (রাজ্যসভা) থাকা কালীন মৃণাল সেন তাঁর এমপি ল্যাড ফান্ড থেকে মিশনের গার্লস স্কুল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য নব্বই লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে মিশনবন্ধু হয়ে ওঠেন। ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে।
দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ।
কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এই পাতা।
এ-বারের সব লেখা ও ছবি বাবনান ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের।

ছোট্ট টিয়া

রুফিদা পারভীন
সপ্তম শ্রেণি

আমি হলাম ছোট্ট টিয়া
পেয়ারা গাছে থাকি,
মাঝে মাঝে লঙ্কা খাই
লোককে দিয়ে ফাঁকি।
কেউ-বা আমায় ধরে নিয়ে
বন্দি করে খাঁচায়,
কেউ-বা আমায় খাঁচা খুলে
ছেড়ে দিয়ে বাঁচায়।

আমি হলাম ছোট্ট টিয়া
পেয়ারা গাছে থাকি।

ফারহানা সুলতানা। সপ্তম শ্রেণি।

প্রবাহিত জীবন

মোস্তাকিম আলি মল্লিক
দশম শ্রেণি

প্রয়োজন আছে, দরকার রয়েছে, এই লিখলাম—
মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ভালো করে নিলাম,
এই জীবনটা ভারি মধুর, এক শান্ত প্রকৃতির বাতাবরণ
নিয়ে চলে আমাকে, নতুন ভাবনার মতাদর্শ।

এগিয়ে যেতে চাই, কিন্তু জীবনে তো বাধা—
এই বাধার বিরুদ্ধে জিহাদ করা তো সাধ্যসাধনা,
চল রে, এগিয়ে চলি— সফলতা দাঁড়িয়ে আছে—
জীবনের মূল্য দিই— সফলতা দাঁড়িয়ে আছে।

ছড়া

লিপি সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি

সোঁদর বনের বাঘ
বসে নদীর ধারে,
গান ধরেছে আপন সুরে
তাইরে-নাইরে নারে।

উত্তর হিমালয়ের দুটি গ্রামের রহস্য

নাইমা আক্তারী
সপ্তম শ্রেণি

ফারহানা পারভীন। ষষ্ঠ শ্রেণি।

হিমালয় পর্বতের উত্তরে ছিল দুটি গ্রাম। ২০০১ সালে প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে গ্রামদুটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই দুটি গ্রাম এখনও মানুষের কাছে দৃশ্যমান হতে পারেনি। গ্রামদুটির নাম ছিল রাজগড় ও চন্দ্রপুর। চন্দ্রপুরের প্রত্যেকটি ব্যক্তির পেশা ছিল মাটির পাত্র তৈরি করা। কিন্তু রাজগড়ে এক সাধু ও এক রাক্ষসের প্রাসাদ ছিল।

চন্দ্রপুরের বিখ্যাত কুমোর ছিল রামলাল। রামলাল ছিল বংশগত কুমোর। কিন্তু রামলাল তার ছেলেকে তিরন্দাজ হওয়ার জন্য পাশের গ্রামে সাধুর কাছে নিয়ে আসে। সাধু ছিলেন একজন বিখ্যাত তিরন্দাজ। সাধুর কাছে আরও অনেক ছেলে তির ছোড়া শিখতে আসত। রামলাল তার ছেলেকে সাধুর কাছে দিয়ে আসার পর তার ছেলের এক বন্ধু হয়, তার নাম কমল। কমল ও রামলালের ছেলে বিমল একদিন তির ছোড়া প্র্যাকটিস করছিল। এক রাজা সাধুর কাছে এসে জানান যে, তাঁর রাজসভায় একটা করে আর-কোনো মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে যান।

উপরোক্ত খবরগুলি জানার পর বিমল ও কমল, এর রহস্য খোঁজ করার জন্য রাক্ষসপুরীতে উপস্থিত হয়। সেদিন রাক্ষস পুজো করছিল। রাক্ষসের প্রাণ ছিল ঠাকুরের হাতে। বিমল ও কমল সেই ঠাকুরের হাতে তির ছোড়ায় রাক্ষস মারা গেল। যেসমস্ত মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে যেতেন তাঁদের খেয়ে ফেলত রাক্ষস। তারপর থেকে কখনো মন্ত্রী অদৃশ্য হননি।

এক অদ্ভুত জীবনকাহিনি

আফ্রিনা সরদার
সপ্তম শ্রেণি

জীবন হল একটা স্রোত, যে-স্রোত অনবরত বয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই জীবন, যার কোনো কূল-কিনারা নেই। জন্মেছি মানেই মরতে হবে— এটাই তো জীবনের নীতি। আজ এক অদ্ভুত জীবনকাহিনির কথা বলি শোনো।

একদা একটা ছোট্ট তোতা জন্মগ্রহণ করেছিল। তার জন্মকাহিনি এক অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে আবদ্ধ। জন্মের পর থেকে সে সবার থেকে আলাদা। মায়ের কোলে সে লালিত-পালিত হত। মায়ের আদর-যত্নে সে হয়ে উঠল সুস্থ সবল। তারপর সে যখন একটু বড়ো হল, তখন সে কখনো তার সমজোড়ি তোতাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। একা একা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকত। তার ছিল না কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। এক সময় তার মা মারা গেল। পৃথিবীতে সে একা। সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠল পূর্ণবয়স্ক। তারপর তার যৌবনজীবনও চলে এল। সে তখন বলতে লাগল, 'আমি একা, শুধু একা, আমার নেই কোনো আপন, যে করবে মোরে আদর-যতন।'

তার সেই কথা শুনে দুঃখিত বোধ করল এক ছোট্ট মেয়ে। তাকে সে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পুষতে লাগল। ধীরে ধীরে দু-জন দু-জনকে প্রচুর ভালোবেসে ফেলল। তারা একে অপরকে ছাড়া অচল। যখন তোতার যৌবনজীবন কেটে গিয়ে বার্ধক্যজীবন চলে এল, তখন সে মৃত্যুবরণও করল। সেই দুঃখে দুঃখী হয়ে ছোট্ট মেয়েটি বলতে লাগল, 'আপন করে নিলাম তোরে, আর দিলি তুই ফাঁকি মোরে।'

আল-আমীন মিশন

আজহারুল হক
র‍্যাঙ্ক ৫০৭

সাদরুল আলম
র‍্যাঙ্ক ৭৪৮

জাহাঙ্গির আলম
র‍্যাঙ্ক ৮০১

মনসুর হাবিবুল্লা
র‍্যাঙ্ক ১০৩১

সেখ সবুর আলি
র‍্যাঙ্ক ১১৪৮

মহ. তুহিন রানা
র‍্যাঙ্ক ১৪৭১

আফ্রিদুজ্জামান
র‍্যাঙ্ক ১৪৯৬

ইমরান সেখ
র‍্যাঙ্ক ১৫৫৭

মহ. ইমতিয়াজ
র‍্যাঙ্ক ১৬৮৯

গোলাম রেজা
র‍্যাঙ্ক ১৭০৫

ইঞ্জিনিয়ারিঙে কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

৫০০০-এর মধ্যে	৭৫০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১২৫০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
৩৭ জন	৬১ জন	৮৬ জন	১১৭ জন	১৫২ জন

সিনান হাম্মাম মিঞা
র‍্যাঙ্ক ১৭৮৫

রুবেল সেখ
র‍্যাঙ্ক ২০২৯

আজম খান
র‍্যাঙ্ক ২২৫৪

মহ. সাঈফ
র‍্যাঙ্ক ২৩৮৭

আকিব উদ্দিন
র‍্যাঙ্ক ২৫৬৭

সানিউল সেখ
র‍্যাঙ্ক ২৬৭১

চয়ন আসিফ খান
র‍্যাঙ্ক ২৭৫১

মহ. আরিফ
র‍্যাঙ্ক ২৭৭৪

মহ. হাসেম
র‍্যাঙ্ক ২৮৪৭

তামিম আক্তার
র‍্যাঙ্ক ২৯৩৯

ইনজামামুল হক
র‍্যাঙ্ক ৩২৩৩

আরিফ মহম্মদ
র‍্যাঙ্ক ৩৩৫৭

সাফিউল আলম
র‍্যাঙ্ক ৩৩৭৮

মোতালেব মোল্লা
র‍্যাঙ্ক ৩৪৭৪

মাহাতাব মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৩৫০০

মহ. করিম সেখ
র‍্যাঙ্ক ৩৫০৯

সাবির মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৩৫৭০

জামালুদ্দিন মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৩৫৮৫

সোহেল অখতার
র‍্যাঙ্ক ৩৭৪৩

ইমতিয়াজ হাসান
র‍্যাঙ্ক ৩৭৭৬

সাকিল হাসান
র‍্যাঙ্ক ৩৯৯৭

আনিস আহমেদ
র‍্যাঙ্ক ৪০০৫

ইরফানুর রহমান
র‍্যাঙ্ক ৪৩০৫

কবিরুদ্দিন সেখ
র‍্যাঙ্ক ৪৪৬১

আষিক সেখ
র‍্যাঙ্ক ৪৭০১

ওমর ফারুক
র‍্যাঙ্ক ৪৭০২

ওবাইদুল রহমান
র‍্যাঙ্ক ৪৯৭৭

রফিকুল ইসলাম
র‍্যাঙ্ক ৫০৭৯

তৌসিফ আহমেদ
র‍্যাঙ্ক ৫০৯৮

সাজিদ সেখ
র‍্যাঙ্ক ৫২২৮

আরিফ হোসেন
র‍্যাঙ্ক ৫৩৪০

সানিউর রহমান
র‍্যাঙ্ক ৫৩৫২

আয়াজ জামির
র‍্যাঙ্ক ৫৩৭১

এজাজ হোসেন
র‍্যাঙ্ক ৫৪১২

সাকিল আহমেদ
র‍্যাঙ্ক ৫৫৬২

আসিফ আলি
র‍্যাঙ্ক ৫৬০৭

আসরাফুর রহমান
র‍্যাঙ্ক ৫৭৬৬

নুরুদ্দিন মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৫৭৮১

জাহাঙ্গির সেখ
র‍্যাঙ্ক ৫৯৩৮

ইলিয়াস মিঞা
র‍্যাঙ্ক ৫৯৬৫

মিনারুল ইসলাম
র‍্যাঙ্ক ৫৯৭৭

সাকিল হোসেন
র‍্যাঙ্ক ৬০০১

হাসিব হোসেন
র‍্যাঙ্ক ৬১০৫

মহ. আসাদুজ্জামান
র‍্যাঙ্ক ৬১১৫

আল-রিয়াদ
র‍্যাঙ্ক ৬৫৫৪

হামিদুল হক
র‍্যাঙ্ক ৬৫৮৪

রোকেয়া হাবিবা
র‍্যাঙ্ক ৬৬৪০

তৌসিফ আহমেদ
র‍্যাঙ্ক ৭০৮৪

হাসান তৌফিক
র‍্যাঙ্ক ৭০৯১

আলতাফুর রহমান
র‍্যাঙ্ক ৭১২১

আনোয়ার হোসেন
র‍্যাঙ্ক ৭১৪৮

আল-আমীনের আবাসিক শাখাসমূহ